# চাঁদমামা

জুলাই ১৯৭৪

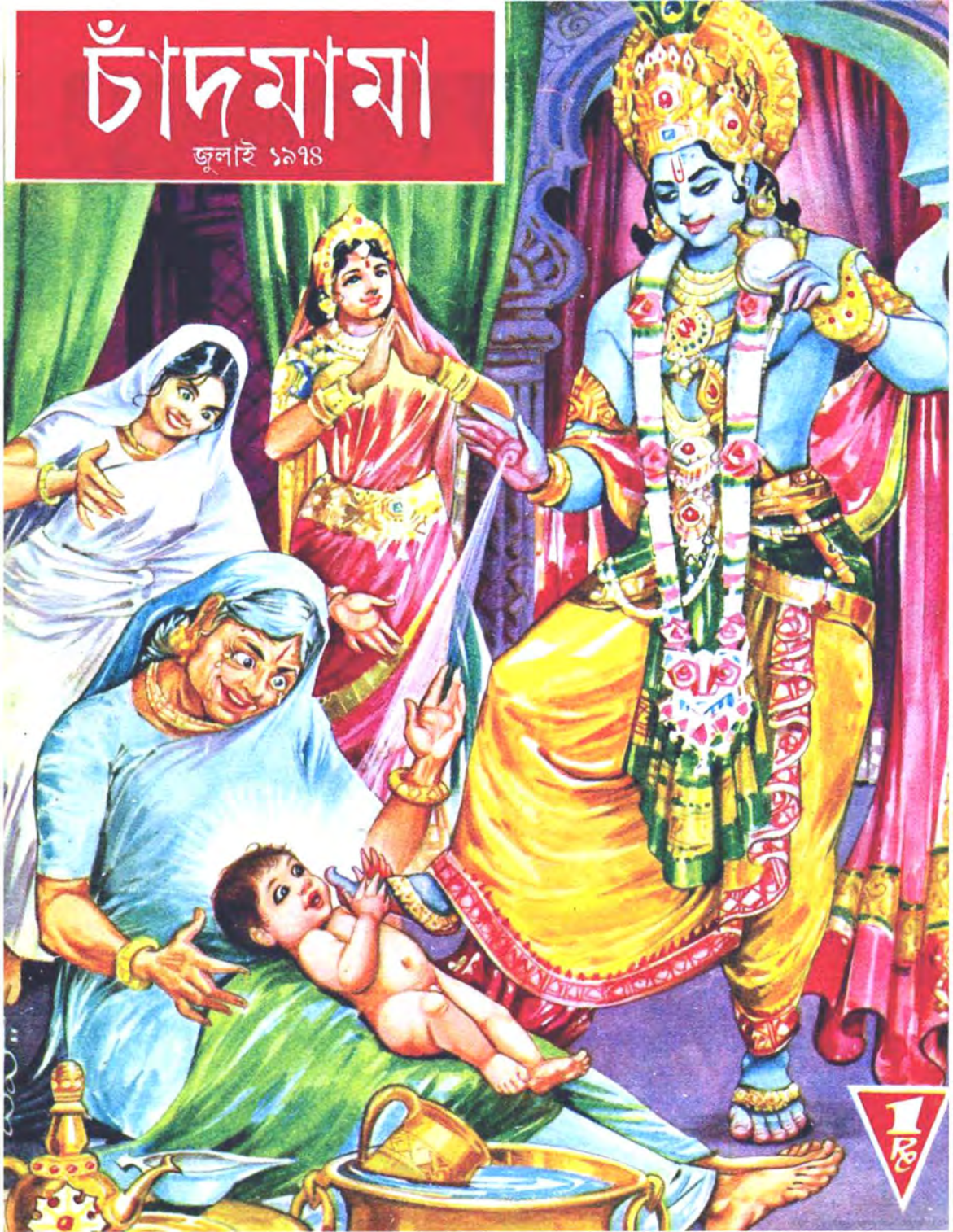

1 রু

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন ও স্ক্যান করেছেন : ঝাড়গ্রাম ডেভিলস

এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ড

## একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optimcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

*Photo by:* **MADAN GOPAL**

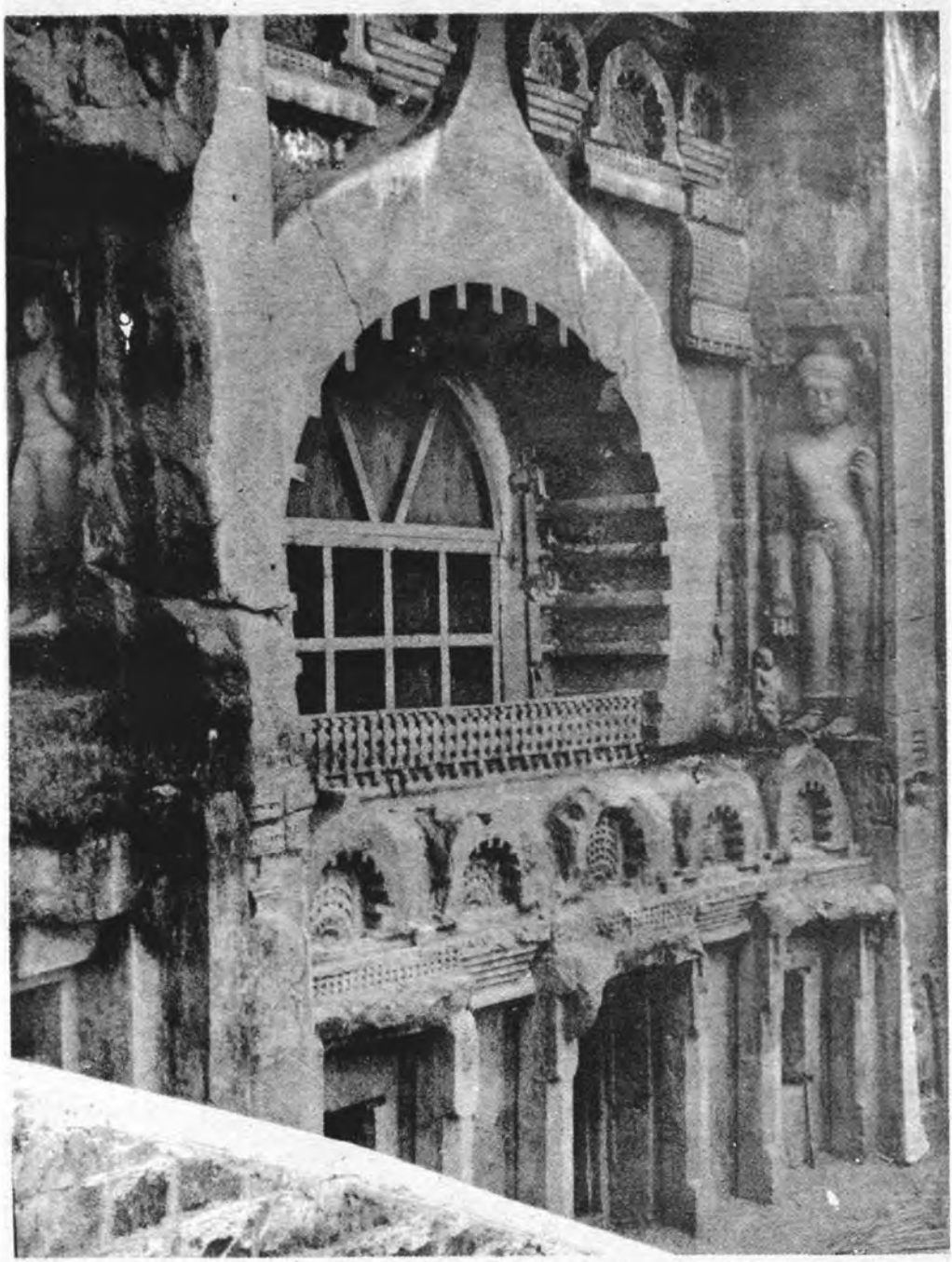

ANCIENT SCULPTURE

পেটের গোলমাল?
সে আবার কি বাপু?
কোনদিন শুনিনিতো!

ডাবর
গ্রাইপ
ওয়াটার

প্রত্যেক মায়ের কাছে
তার শিশুর মতন প্রিয়

শিশুদের বদহজম, অম্বল,
পেটব্যথা, বায়ু ও দাঁত ওঠার
সময় ব্যথার
একটি সুস্বাদু,
সুনিশ্চিত
সমাধান

ডাবর ( ডাঃ এস. কে. বর্ম্মন ) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

# এন পি ক্ল্যাসিক চেক প্রতিযোগিতা

আমাদের ক্রেতাদের দাবীর চাপে পূরিত প্রবেশ পত্র গ্রহণের শেষ তারিখ **৩১শে জুলাই ১৯৭৪ পর্যন্ত বর্দ্ধিত হল।**

**ফলাফল ১৯৭৪-এর সেপ্টেম্বরে**

মনে রাখবেন সমস্ত প্রবেশ পত্রের সঙ্গে যেন অবশ্যই এন্ পি ষ্ট্রিপ প্যাকস্ (2s) এর দশটি খালি মোড়ক থাকে।

আপনার কাছের এন্ পি বিক্রেতার কাছ থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করুন।


## চাঁদমামার গ্রাহকদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

আপনি যদি নিজের ঠিকানা বদলাতে চান তাহলে পাঁচ তারিখের মধ্যে গ্রাহক সংখ্যাসহ আপনার নতুন ঠিকানা আমাদের জানান। দেরি করলে পরের মাস থেকে নতুন ঠিকানায় 'চাঁদমামা' পাঠাব। আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

**ডলটন্ এজেন্সীস**
চাঁদমামা বিল্ডিংস
মাদ্রাজ-৬০০ ০২৬

*FOR PRECISION IN...*

# Colour Printing

*By Letterpress...*

...Its B. N. K's., superb printing
that makes all the difference.
Its printing experience of
over 30 years is at the
back of this press superbly
equipped with modern
machineries and technicians
of highest calibre.

***B. N. K. PRESS***
***PRIVATE LIMITED,***
*CHANDAMAMA BUILDINGS,*
*MADRAS-26.*

প্রত্যেক গ্রন্থালয়ে
রাখার যোগ্য

★

'SONS OF PANDU'
Rs. 5-25

'THE NECTAR OF THE GODS'
Rs. 4-00

ইংরাজীতে রচিত ঃ লেখিকা
শ্রীমতী মধুরম্ ভুতলিঙ্গম্

উপহার দেওয়ার ও সংগ্রহ
করে রাখার মত বালক-
বালিকাদের উপযোগী গ্রন্থ

★

আজকেই যোগাযোগ করুন ঃ

ডল্টন এজেন্সীস
চাঁদমামা বিল্ডিংস
মাদ্রাজ-৬০০ ০২৬

here
comes
the
scholar

-the finest pen
for students
from
BLACKBIRD

Now Blackbird creates
'Scholar' specially
for students. With a
light streamlined body
for easy grip ...and a
fine iridium tipped nib
for silken smooth ink
flow. See it. Try it.
You will agree it's the
pen that deserves
full marks!

SCHOLAR PEN—
ANOTHER QUALITY PEN
FROM THE WORLD
FAMOUS BLACKBIRD
FAMILY.

heros'-S(132 A

বি. নাগি রেড্ডী নিবেদিত

বিজয়া ও সুরেশ কম্বাইন্স এর

# প্রেমনগর

জেমিনীকৃত ইষ্টম্যান কালার

চুয়াত্তরের সাড়া জাগানো চলচ্চিত্র

রাজেশ খান্না ও হেমা মালিনী

প্রথম দু'জনে একসঙ্গে একটি অপূর্ব্ব রোমান্টিক প্রেমকাব্যে
আর সঙ্গে রয়েছে খ্যাতনামা চিত্রতারকাদের সমারোহ

পরিচালনা : কে. এস্. প্রকাশ রাও সঙ্গীত : এস্. ডি. বর্মণ
প্রযোজনা : ডি. রামা নাইডু

প্রেমনগর—দু'জনের এক আশ্চর্য্য প্রেম চিহ্ন...
স্বপ্ন রূপ নিল বাস্তবে...

everest/507/PP Ben

# চাঁদমামা

সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : চক্রপাণি

এমাসের বেতাল কথা 'পরিশ্রমের ফল', একটি চমৎকার কাহিনী।

কথায় কথায় আমরা 'দেশভক্ত', 'দেশদ্রোহী' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে থাকি। রাজা-রাজড়াদের আমলেও 'রাজ-ভক্ত', 'রাজদ্রোহী' প্রভৃতি শব্দ চালু ছিল। এসব শব্দ অর্থহীন। রাজা পাপী হলে রাজদ্রোহী দেশভক্ত হতে পারে, আবার অন্য অবস্থায় দেশদ্রোহী রাজভক্ত হতে পারে। এই বক্তব্যকেই 'যে কথা অর্থহীন' কাহিনীতে ভালভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।'

ভেজাল বিরোধী গল্প 'ধড়িবাজ দুধ-ওয়ালা।

ফটো-নামকরণ প্রতিযোগিতায় শুধু পোস্ট কার্ডের মাধ্যমেই অংশগ্রহণ করতে হবে।

খণ্ড ৩ জুলাই ১৯৭৪ সংখ্যা ১

CHITRA

# অমরবাণী

বিদ্যা বিবাদায়, ধনং মদায়
শক্তিঃ পারেষায় পরিপীড়নায়
ক্ষলস্য ; সাধোর্বীপরীত মেতৎ,
জ্ঞানায়, দানায় চ, রক্ষণায়। ॥১॥

[ দুর্জনরা শিক্ষাকে ঝগড়ার জন্য, টাকাকে অহঙ্কার দেখানোর জন্য ও শক্তিকে দুর্বলদের পীড়ন করার জন্য ব্যবহার করে। আর এর বিপরীত ধর্মীরা জ্ঞানার্জনের জন্য (লেখাপড়া), দানের জন্য (অর্থ) আর অন্যদের বাঁচানোর জন্য (শক্তি) ব্যবহার করে। ]

সমুদ্র মন্থনে লেভে
হরিলক্ষ্মীং, হরো বিষম্ ;
ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র,
ন বিদ্যা, ন চ পৌরুষম্। ॥২॥

[ সমুদ্র মন্থনের সময় বিষ্ণু পেলেন লক্ষ্মী আর শিব পেলেন বিষ। ফল ভাগ্য-নির্ভর, বিদ্যা অথবা পৌরুষ নির্ভর নয়। ]

গুণবন্তঃ ক্লিশ্যন্তে প্রায়েণ,
ভবন্তি নির্গুণাঃ সুখিনঃ ;
বন্ধন মায়ান্তি শুকাঃ,
যথেষ্ট সঞ্চারিণঃ কাকাঃ। ॥৩॥

[ গুণবানরা সাধারণত কষ্ট পেয়ে থাকে, যাদের কোন গুণ নেই তারা সুখেই থাকে। পাখিরা বন্ধনে বাঁধা পড়ে, কাক বেশ ঘুরে বেড়ায়।

---

পার্থক্য

---

# যক্ষপর্বত

## চব্বিশ

[বীরপুরের রাজকুমারী বসন্তকুমারীকে যক্ষের কবল থেকে উদ্ধার করে আনার প্রতিশ্রুতি বীরপুরের মন্ত্রীকে দিল খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত। যক্ষমণিভূষণের আনা নৌকোয় করে রওনা হল। সূর্যাস্তের সময় ওরা একটি পাহাড়ের কাছে পৌঁছাল। জীবদত্তের নির্দেশে মণিভূষণ নৌকোটাকে তীরে ভেড়াল। তারপর···]

নৌকো তীরে ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত লাফ দিয়ে তীরে উঠল। মাটিতে নেমে জীবদত্ত মণিভূষণকে বলল, "নৌকোটাকে তীরের কোন বটগাছের সঙ্গে বেঁধে দাও। তাতে যেসব ফলমূল আছে প্রয়োজন হলে তুমি খেয়ে নাও। এই ঘন অরণ্যে আমার মনে হচ্ছে হরিণ অথবা বুনো শূয়োর শিকার করে আনা যাবে।"

এই কথা শুনে ভয় পেয়ে যক্ষ মণিভূষণ বলল, "জীবদত্ত, পাহাড়ের এসব অঞ্চলে বেশি ঘোরাঘুরি করা উচিত নয়। এখানে ভয়ঙ্কর রাক্ষসদের নিবাস।"

"রাক্ষসের চেয়ে মন্ত্রে সিদ্ধ তোমার যক্ষ বেশি ভয়ঙ্কর। আমরা তাকে মোকাবিলা করতে যাচ্ছি। সেক্ষেত্রে এই রাক্ষসগুলোকে ভয় পাব কেন?" বলে জীবদত্ত খড়্গবর্মার দিকে ঘুরে বলল,

"খড়্গ, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুরে আসছি। তুমি মাটি দিয়ে একটা উনুন বানিয়ে আগুন ধরিয়ে রাখ।"

যেকথা সেই কাজ। এত তাড়াতাড়ি যে জীবদত্ত হরিণ শিকার করে আনবে, তা খড়্গও ভাবতে পারেনি। শিকার করা হরিণকে কাঁধে ফেলে সে নৌকোর কাছে এল।

ততক্ষণে কাঠ জোগাড় করে খড়্গ আগুন ধরিয়ে রাখল। অল্পক্ষণের মধ্যেই খড়্গ ও জীবদত্ত হরিণকে কেটে আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে জমা করতে লাগল। পোড়া মাংসের সুগন্ধে চারদিক ভুর ভুর করছিল। এমন গন্ধ সেই অঞ্চলে এই প্রথম ছড়াচ্ছিল।

ঠিক সেই সময় ভয়ঙ্কর শক্তিশালী রাক্ষসী হুঙ্কার তুলতে তুলতে এগিয়ে আসতে আসতে বলতে লাগল, "মানুষের গন্ধ, মানুষের গন্ধ!" থপ্ থপ্ করে পা ফেলতে ফেলতে রাক্ষসী কাছাকাছি এলে খড়্গবর্মা খাপ থেকে তরবারি বের করে তাকে আঘাত করতে যেতেই জীবদত্ত বাধা দিয়ে ঐ রাক্ষসীকে বলল, "তুমি কি সত্যিকারের রাক্ষসী, না রাক্ষসীর রূপধারী যক্ষ? এখানে কি শুধু মানুষের গন্ধ আছে? হরিণের মাংসের গন্ধ নেই? তুমি সেই গন্ধ পাচ্ছ না?"

জীবদত্তের কথা শুনে অবাক হয়ে রাক্ষসী বলল, "কে তুমি? তুমি যদি মানুষ হতে তাহলে আমাকে দেখে ভয়ে কেঁপে উঠতে, তোমার বুক ধড়াস ধড়াস করত। মনে হচ্ছে তুমি ভয় পাওনি। তাই ঘুরিয়ে আমাকেই প্রশ্ন করছ। তুমি জান আমি কত বড় শক্তিশালী? এত বড় সাহস তোমার।"

রাক্ষসী এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে খড়্গবর্মা মুহূর্তে তার চুল ধরে ফেলল। তাকে তরবারি দিয়ে মারতে যেতেই জীবদত্ত তার তরবারি ধরে, মন্ত্রদণ্ডকে রাক্ষসীর মাথায় ঠেকিয়ে চাপ দিয়ে বলল, "এখন বল, আমরা সাধারণ

মানুষ না অন্য কিছু ?"

রাক্ষসী কাঁপতে কাঁপতে বলল, "আজ্ঞে আপনারা মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। আপনারা যক্ষ। আমাকে ছেড়ে দিন। আমার দুই ছেলেকে ইতিমধ্যেই আপনারা ধরে নিয়ে গেছেন যক্ষ পর্বতে। আমি বুড়ো হয়ে গেছি। ঐ পাহাড়ের পাথর ভেঙে, পাথর সরিয়ে আপনাদের জন্য তাল তাল সোনা আর আমরা তুলতে পারবো না।"

ওর কথা শুনে খড়্গ ও জীবদত্ত হলো বিস্মিত। একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল।

জীবদত্ত খড়্গবর্মাকে তরবারি খাপে পোরার ইশারা করে রাক্ষসীকে বলল, "দেখ রাক্ষসী, তোমাকে মেরে ফেলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তুমি যে বলছ, তোমার দুই ছেলেকে যক্ষ ধরে নিয়ে গেছে, সে কথা যদি সত্য হয়, তাহলে আমরা তোমার দুই ছেলেকে উদ্ধার করে আনব। ঐ যে দেখছ বসে আছে ঐ হল যক্ষ। তাই আমাদের গোপন কথা ওর সামনে হওয়া উচিত নয়। তুমি কোথায় থাক ? চল তোমার নিবাসে যাই। ওখানেই আমাদের কথা হবে।"

তারপর রাক্ষসী যক্ষ মণিভূষণের দিকে তাকিয়ে কাঁদো কাঁদো সুরে বলল,

"হে নরগণ, আপনারা আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন। আমাকে আমার পথে যেতে দিন।"

জীবদত্ত রাক্ষসীকে অভয় দিয়ে বলল, "আমি আর আমার বন্ধু ঐ দুরাত্মা যক্ষ যেখানে থাকে সেই যক্ষ পর্বতে যাচ্ছি। আমরা তাকে কঠোর শাস্তি দেব। আমার ধারণা যক্ষ ঠিক কোথায় থাকে, কি করে সব তুমি জান। তাই আমরা চাইছি তোমার আস্তানায় গিয়ে গোপনে সব খবর জানতে।"

যক্ষ মণিভূষণকে দেখার পর থেকে রাক্ষসীর অন্তরাত্মা পালাই পালাই করছিল। জীবদত্তের কথায় তৎক্ষণাৎ রাজী

হয়ে বলল, "হে নরগণ, আপনারা আসুন আমার গুহায়। আমার কর্তাও সেখানে আছেন। যক্ষ পর্বতের অনেক খবর উনি আপনাদের দেবেন। অত খবর আমি কোন দিন জানতে পারব না। অনেক ভয়ঙ্কর খবর উনি জানেন।"

জীবদত্ত তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে যাওয়ার জন্য রাজী হয়ে খড়্গবর্মাকে বলল, "খড়্গ, আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তোমার তরবারি ও আমার এই মন্ত্র-দণ্ডের অসীম ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। যক্ষ মণিভূষণ অথবা যক্ষ মণিরঞ্জিত এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করলে তুমি বিনা দ্বিধায় তাদের উপর অস্ত্র প্রয়োগ করবে।"

ঐ কথা শুনতে পেয়ে যক্ষ মণিভূষণ আমতা আমতা করে বলল, "জীবদত্ত, তুমি ওর কথা শুনে যেও না। রাক্ষসদের বিশ্বাস নেই। ওদের চেয়ে নিষ্ঠুর আর কেউ হয়না। ঐ রাক্ষসী তোমায় ভাল ভাল কথা বলে গুহায় নিয়ে যাচ্ছে। ওরা ভয়ঙ্কর! ওরা নিষ্ঠুর! ওরা অদ্ভুত! ওরা কিম্ভূত! ওখানে আপনাকে টেনে ছিঁড়ে মহানন্দে খেয়ে ফেলতে পারে।"

জীবদত্ত হাসতে হাসতে বলল, "তাতে কোন ক্ষতি হবেনা। আমার বন্ধু খড়্গ-বর্মা রয়েছে। সে একাই যক্ষ মণি-ভূষণ ও মণিরঞ্জিতকে বধ করে রথ গুঁড়িয়ে দুই রাজকুমারীকে নিয়ে নিরা-পদে ফিরতে পারবে।"

জীবদত্তের কথা শুনে মণিভূষণের ভীষণ রাগ হল। কিন্তু রাগ প্রকাশের সাহস তার ছিলনা। মাথা নিচু করে ফুলতে লাগল। তার চোখের সামনে রাক্ষসীর পেছনে পেছনে জীবদত্ত দৃপ্ত পদক্ষেপে চলে গেল।

রাক্ষসী জীবদত্তকে নিয়ে চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটি গুহায় পৌঁছাল। গুহার কাছে চিতার মত আগুন জ্বালিয়ে ঐ রাক্ষসীর স্বামী রাক্ষস একটি পাথ-রের উপর বসে ছিল। জীবদত্তকে নিয়ে

রাক্ষসীকে আসতে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সে রাক্ষসীকে বলল, "কে এই নর্? তোমার সঙ্গে নির্ভয়ে একা একা আসছে?"

রাক্ষসী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে রাক্ষসকে বলল, "তোমার চোখ মুখের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তোমার খুব খিদে পেয়েছে। কিন্তু সাবধান, একে কিছু করো না। এর হাতে যে মন্ত্রদণ্ড আছে তা ভয়ঙ্কর। এ আর এর বন্ধু, দুজনে মিলে যক্ষদের বন্দী করেছে।"

বউএর কথা শুনে রাক্ষস হতবাক হয়ে গেল। মানুষ যে কোন যক্ষকে বন্দী করতে পারে এ ছিল তার কল্পনার অতীত। সে জীবদত্তের কাছে এসে সবিনয়ে বলল, "প্রভু, আমার বউ যা বলছে তা যদি সত্য হয়, আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনি বলুন। আমার বউ ভুল বকছে নাতো প্রভু? কারণ ওর মাথার একটু গোলমাল আছে। এসব কি সত্য?"

জীবদত্ত একটু হেসে বলল, "তোমার বউ যা বলছে তা মিথ্যা নয়। ওর কাছেই শুনেছি তোমার ছেলেদের নাকি যক্ষ ধরে নিয়ে গিয়ে যক্ষ পর্বতের কোথায় যেন লুকিয়ে রেখেছে। তুমি যক্ষ পর্বতের ব্যাপারে কিছু বলতে পার?"

রাক্ষস আপন মনে কিছুক্ষণ মাথা নেড়ে জীবদত্তের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখুন, আপনার মন্ত্রদণ্ডের ক্ষমতা যে অনেক বেশি তা বুঝতে পারছি। তা না হলে আপনি আমার সামনে এসে এভাবে কথা বলতে পারতেন না। যক্ষ পর্বতের ব্যাপারে আমি আর কি বলব? বিশাল বিন্ধ্য পর্বতমালার এই অঞ্চলে যক্ষ পর্বত হল একটি ছোট্ট পর্বত। এই পর্বতের অধিপতি হল যক্ষ মণিরঞ্জিত। যক্ষরাজ বহুকাল আগে তাকে এই যক্ষ পর্বতের অধিপতি করে দিয়েছিল। তারপর থেকে ঐ মণিরঞ্জিত করেনি এ-হেন খারাপ কাজ নেই।"

জীবদত্ত রাক্ষসের কথায় সহানুভূতির সঙ্গে সায় দিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "ঐ মণিরঞ্জিত যে অত্যন্ত খারাপ প্রকৃতির লোক তা আমরা জানি। আমাদের দেশের দুজন রাজাকে খুব দুঃখ দিয়েছে। তাদের একমাত্র কন্যাদের অপহরণ করে নিয়ে গেছে। আমরা সে ব্যাপারে যা করার যথাসময়ে করব। এখন আমরা জানতে চাই ঐ যক্ষ মণি-রঞ্জিত তোমাদের মত রাক্ষসদের নিয়ে গিয়ে সেখানে কি করে ?"

"শোনা কথা বলছি, আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। ঐ যক্ষ পর্বতে নাকি মণি-মাণিক্য আর তাল তাল সোনা আছে। বড় বড় পাথর কেটে ঐ সব মাণিক্য সোনা তোলা খুব শক্ত কাজ। আমাদের ধরে নিয়ে গিয়ে যক্ষ সেই কাজগুলো করায়। একবার যে তার কবলে পড়েছে তাকে সারা জীবন ঐ পাহাড়ের অন্ধকারে রাত দিন পরিশ্রম করতে হচ্ছে। শুধু যে ও রাক্ষসদেরই ধরে নিয়ে গেছে তা নয়, নানা বনের বহু মানুষ তার কবলে পড়ে দিনরাত খেটে মরছে।" বলল ঐ বিশালদেহী রাক্ষস।

"তার মানে, একবার যাকে সে ধরেছে, সে যাতে পালাতে না পারে তার সব ব্যবস্থাই সতর্কতার সঙ্গে সে করেছে। ভাল কথা, শুনলাম ওখানে নাকি একটা পাথরের রথ আছে ?" জীবদত্ত সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল।

"আমিও শুনেছি। কোনদিন দেখিনি। আর দেখতে চাইও না।" বলল রাক্ষস।

জীবদত্তের মনে হল তার সমস্ত প্রশ্নের জবাব সে পেয়েছে। পরের মুখে শুনে রাক্ষসের যে ধারণা হয়েছে তাই সে জানিয়েছে। বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলেনি। জীবদত্ত এবার ঠিক করল এবার ফিরে যাবে খড়্গবর্মা ও মণিভূষণের কাছে। রাক্ষসীকে সে বলল, "তুমি যে মানুষের গন্ধ মানুষের গন্ধ বলে ছুঁটতে ছুঁটতে এলে তাতে আমার ভালই হল। আমার

সঙ্গে এসো। ওখানে অনেক হরিণের পোড়া মাংস আছে। তোমার যত দরকার নিয়ে এসো।"

ওর কথা শুনে রাক্ষসীর খুব ভাল লাগল। সে রাক্ষসকে ফিসফিস করে কি যেন বলল। রাক্ষস জীবদত্তকে বলল, "প্রভু, আপনার সাহস দেখে মনে হচ্ছে আপনারা মণিরঞ্জিতকে বধ করতে পারবেন। বধ করে দয়া করে আপনারা আমার দুই ছেলেকে উদ্ধার করে আমাদের কাছে পৌঁছে দিন।"

জীবদত্ত এগোতে এগোতে রাক্ষসকে বলল, "দেখ রাক্ষস, তোমার নাম আমি জানি না। তবে এটুকু জেনে রেখো, আমরা যদি মণিরঞ্জিতকে জব্দ করতে পারি, তাহলে শুধু তোমার ছেলেরাই নয় সবাই সেখান থেকে মুক্তি পাবে।"

"আজ্ঞে আমার নাম চণ্ডমুখ। ভুলে যাবেন না।" বলল রাক্ষস।

দূর থেকে জীবদত্তের সঙ্গে রাক্ষসীকে আসতে দেখে ভীষণ ভাবে ঘাবড়ে গিয়ে মণিভূষণ খড়্গবর্মাকে বলল, "একি আপনার বন্ধু আবার ঐ রাক্ষসীকে নিয়ে আসছে কেন?"

"বলা যায়না হয়তো রাক্ষস রাক্ষসীদের খেয়ে ফেলার জন্য জীবদত্ত তোমাকে তাদের হাতে তুলে দেবে।" খড়্গবর্মা

মজা করার জন্য বলল।

"এটা কিন্তু খুব অন্যায় হবে। আমি কতবার বলেছি মণিরঞ্জিত আমার বন্ধু নয়, আমার প্রভু। ওর আজ্ঞা পালন করা ছাড়া আমি কারও কোন ক্ষতি করিনি।" মণিভূষণ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কাকুতিমিনতি করে বলল।

ঐ কথা কাণে যেতেই জীবদত্ত রেগে গিয়ে বলল, "ওহে মণিভূষণ, এখনি অত ঘাবড়ে যেও না। এই রাক্ষসীর স্বামীর কাছে তোমাদের যক্ষ পর্বতের অনেক রহস্য জানতে পেরেছি। তোমাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে। আজ আমি ও খড়্গবর্মা তোমার প্রভু মণিরঞ্জিতকে

যদি পরাজিত করতে না পারি তাহলেও বেশিদিন আর তোমাদের বাঁচতে হবে না। জেনে রেখো, যোগ্য নেতৃত্বে বিরাট এক রাক্ষসের সেনাবাহিনী যে কোন মুহূর্তে যক্ষ পর্বত আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। যে কোন সময় ওরা তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

"রাক্ষসবাহিনী!" মণিভূষণ ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

"হ্যাঁ, রাক্ষসবাহিনী। ভুলে যেও না। ওরা সব প্রস্তুত।" বলে জীবদত্ত রাক্ষসীকে বলল, "এখান থেকে হরিণের মাংস তোমার যত ইচ্ছে নিয়ে যাও। তোমাদের রাক্ষস সেনানায়ককে বলো বাহিনীকে প্রস্তুত রাখতে। খবর পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে যেন সে ঐ সব পথ দিয়ে চলে আসে।"

রাক্ষসী কিছু বুঝুক-না-বুঝুক মাথা নেড়ে হরিণের মাংস নিয়ে চলে গেল। তারপর খড়্গ জীবদত্ত মণিভূষণ খাওয়া দাওয়া সেরে একটি গাছের নিচে পাথরের উপর শুয়ে পড়ল। শোয়ার সময় মণিভূষণ ঐ নৌকোর দিকে মুখ রেখে বার বার তার দিকে তাকাতে লাগল। তখন জীবদত্ত আস্তে আস্তে খড়্গবর্মাকে বলতে লাগল, "মনে হচ্ছে এই যক্ষটা আমাদের ভীষণ ভয় পেয়েছে। মাঝরাত্রে সুযোগ বুঝে নৌকোয় করে ব্যাটা পালানোর চেষ্টা করবে। একটু সতর্ক থাকতে হবে আমাদের।"

ঠিক একই ধরনের সন্দেহ খড়্গবর্মার মনেও জেগেছিল। খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত পালা করে ঘুমোতে লাগল। হরিণের মাংসের গন্ধে গভীর রাতে কয়েকটা জীবজন্তু সেখানে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। ওরা মণিভূষণের দিকে এগোতে থাকলে খড়্গ ঢিল ছুঁড়ে ওদের তাড়িয়ে দিল। সেই শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেলে, মণিভূষণ ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, "খড়্গবর্মা, জীবদত্ত আপনারা উঠুন, রাক্ষসের বাহিনী এদিকে ছুটে আসছে।"(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

# পরিশ্রমের ফল

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ঐ গাছের কাছে ফিরে গিয়ে গাছের উপর উঠে সেখান থেকে শব নিয়ে গাছ থেকে নেমে সোজা শ্মশানের দিকে নীরবে হাঁটতে লাগিলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, তুমি এত পরিশ্রম করছ যে বলার নয়। কিন্তু তুমি হয়ত জান না, এই জগতে পরিশ্রম করে একজন আর তার ফল ভোগ করে অন্য জন। এই প্রসঙ্গে তোমাকে একটি কাহিনী বলছি, শোন। এতে তোমার পরিশ্রম লাঘব হতে পারে।" বেতাল তার কাহিনী শুরু করল :

প্রাচীনকালে এক দেশে এক রাজা ছিলেন। বহু বছর পরে তার একটি মেয়ে হল। রাজার একমাত্র মেয়ে আদরে লালিত পালিত হল। সব রকমের শিক্ষা যাতে তার হয় সে বিষয়ে রাজার চেষ্টার অন্ত ছিল না। রাজকন্যা যথা-

বেতাল কথা

সময়ে বড় হলে রাজার মনে তার বিয়ের চিন্তা ঢুকল।

রাজা তার মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্রের খোঁজ করতে শুরু করবেন এমন সময় রাজকুমারীর এক বিচিত্র রোগ ধরল। খেত না, ঘুমোত না। সব সময় বিড় বিড় করে কি যে বকত তা সে নিজেই জানে না। কত বৈদ্য এল কত ওষুধ দেওয়া হল কিন্তু রাজকুমারীর রোগ সারল না। রাজার অশান্তি দিনের পর দিন বেড়ে যেতে লাগল। তারও ঘুম খাওয়া ডকে উঠল।

কিছুতেই যখন রাজকুমারীকে সারানো গেল না তখন রাজা নিজের দেশে এবং অন্য দেশে একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করল। যে তার মেয়ের রোগ সারিয়ে দেবে সে রাজকুমারীকে বিয়ে করতে পারবে এবং তাঁর পরে ঐ দেশের রাজা হতে পারবে।

এই ঘোষণা শুনে দেশবিদেশ থেকে কত বৈদ্য এল কিন্তু কেউ রাজকুমারীর রোগ ধরতেই পারল না, সারানো তো দূরের কথা।

এমন সময়ে দেশের শেষ প্রান্তের এক মন্দিরে এক সন্ন্যাসী এসে আস্তানা গাড়ল। ঐ সন্ন্যাসী দেশের বিভিন্ন লোকের নানান ধরণের রোগ সারাতে লাগল। এই কথা খুব তাড়াতাড়ি রাজার কানে গেল। রাজা জানতে পারল যে ঐ সন্ন্যাসী ঐ মন্দির ছাড়া অন্য কোথাও যেতে চায় না। তাকে অন্য কোন জায়-গায় কেউ নিয়ে যেতে পারে না। তখন বাধ্য হয়ে রাজা সপরিবারে ঐ সন্ন্যাসীর কাছে গেল।

সন্ন্যাসী রাজকুমারীকে দেখে বলল যে তার কোন অসুখ নেই। শুধু এক ব্রহ্ম রাক্ষসী তাকে জ্বালাচ্ছে। সেই তার উপর ভর করে রাজকুমারীকে দিনের পর দিন কষ্ট দিচ্ছে এবং ভীষণ ভোগাচ্ছে।

"ঐ ব্রহ্ম রাক্ষসীর হাত থেকে রক্ষা

পাবার উপায় কি ?" রাজা সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করল।

"মহারাজ, কাল থেকে আপনার মেয়ের হাত দিয়ে ব্রাহ্মণদের দানধর্ম করান। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ব্রাহ্মণরা যা চাইবে তাই মেয়ের হাত দিয়ে দান করুন। সে যে ব্রাহ্মণকে দান করতে রাজী হবে না সেই ব্রহ্ম রাক্ষসীকে তাড়াতে পারবে।" সন্ন্যাসী বুঝিয়ে বলল।

রাজা তার পরের দিন মেয়ের হাত দিয়ে দান ধর্ম আরম্ভ করালেন। কাতারে কাতারে ব্রাহ্মণ আসতে লাগল। রাজকুমারী কোন ব্রাহ্মণকেই দান করতে গররাজী হল না। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ অনেক দান নিয়ে ফিরতে লাগল।

এ ভাবে এক বছর কেটে গেল। একদিন এক ব্রাহ্মণ দান নেবার আশায় এল। তাকে অনেক দূর থেকে দেখতে পেয়েই রাজকুমারী চিৎকার করে বলল, "ওকে যেতে বল, ওকে আমি দেব না। যেতে বল।" বলতে বলতে রাজকুমারী অন্দরমহলে চলে গেল।

রাজা ঐ ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, "হে ব্রাহ্মণ, আপনি কি মন্ত্র জানেন ? আমার মেয়েকে এক ব্রহ্ম রাক্ষসী বহু বছর ধরে জ্বালাচ্ছে। আপনি কি তাকে ছাড়াতে পারেন ?"

ঐ ব্রাহ্মণ রাজকুমারীর ঘাড় থেকে ব্রহ্ম রাক্ষসীকে নাবাল। রাজকুমারী

সেরে উঠল। রাজা ভাবল ঐ ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে দেবে। ঠিক সেই সময় ঐ সন্ন্যাসী এসে রাজাকে বলল, "রাজা, আপনার মেয়ের সঙ্গে আমারই বিয়ে দেওয়া উচিত। ন্যায় বিচারে আপনার পরে আমারই এই দেশের রাজা হওয়া উচিত।"

রাজা ঐ সন্ন্যাসীর সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে দিল এবং ঐ ব্রাহ্মণকে হাজার মুদ্রা দিয়ে বিদেয় করল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, ঐ রাজা এত বড় অন্যায় কাজ করল কেন? ঘোষণা মত কাজ করল না কেন? ব্রাহ্মণের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে ঐ সন্ন্যাসীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিল কেন? রাজা কি সন্ন্যাসী অভিশাপ দিতে পারে ভাবল? সন্ন্যাসীকে জামাই বানাতে রাজার ভাল লাগল? এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

বেতালের কথার জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, "ঘোষণা অনুযায়ী রাজা ব্রাহ্মণের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিত। কিন্তু সন্ন্যাসী এসে তার ভুল ভেঙ্গে দিল। ঘোষণার মর্মার্থ রাজা বুঝতে পারল। রাজকুমারী ঘাড় থেকে যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মরাক্ষসীকে নাবাল সে কিন্তু রাজকুমারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে আসেনি। দান নিতে এসেছিল। কিন্তু সন্ন্যাসীর ব্যাপার আলাদা। সেই জানিয়ে ছিল কিভাবে কি করলে রাজকুমারী সেরে উঠবে। টানা একবছর ধরে রাজকুমারীকে বিয়ে করার আশায় অপেক্ষা করছিল সন্ন্যাসী। এবং ঠিক সময়ে হাজির হয়ে রাজাকে নিজের মত জানাল। রাজা বুঝল যে রাজকুমারীর রোগ সেরে ওঠার ক্ষেত্রে সন্ন্যাসীরই অবদান বেশি আছে। ব্রাহ্মণ নিমিত্ত মাত্র।"

রাজা বিক্রমাদিত্য এই ভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে গায়েব হয়ে আবার সেই গাছে উঠে পড়ল। (কল্পিত)

# নীতির পরিবর্তন

উদয়নগরের মহারাজ প্রাণী হত্যাকারীদের কঠিন শাস্তি দিতেন। উনি নিজে শিকার করতে ভালবাসতেন। প্রাণীহত্যা যেহেতু তাঁর শাসন নীতির বিরুদ্ধ কাজ সেই হেতু তিনি ছদ্মবেশে শিকার করতে রাত্রের অন্ধকারে যেতেন।

একদিন এক পাহাড়ী অঞ্চলের অধিবাসী শহরে মাংস বিক্রি করতে এলে রাজ-কর্মচারীরা তাকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা তাকে চাবুক মেরে তার ছাল চামড়া তুলে দিলেন। পাহাড়ী লোকটা শরীরের অসহ্য জ্বালা নিয়ে ফিরে গেল।

সেই রাত্রে রাজা কোন শিকার পেলেন না। শিকার না করে রাজা কোন দিন ফেরেন নি। মন খারাপ করে ফিরতে ফিরতে রাজা দেখতে পেলেন পাহাড়ীদের বাড়ির কাছে খরগোস ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। রাজা খরগোস ধরতে গেলেন। রাতজাগা ঐ পাহাড়ী লোকটা অন্ধকারে কাকে যেন ছোটাছুটি করতে দেখে চিৎকার করল। ছদ্মবেশী রাজা ধরা পড়লেন তাদের হাতে। ওরা তাঁকে গাছের সঙ্গে বেঁধে দিল।

সকালে রাজপ্রাসাদে রাজাকে দেখতে না পাওয়ায় তুলকলাম কাণ্ড হয়ে গেল। চারদিকে খোঁজাখুঁজির খবর পেয়ে ঐ পাহাড়ী লোকটা মন্ত্রীকে ডেকে এনে গাছে বাঁধা লোকটাকে দেখাল। মন্ত্রী চিনতে পেরে রাজাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল।

সেদিন থেকে ঐ রাজার শাসননীতিতে প্রাণীহত্যা আইনসম্মত কাজ হল।

# যে কথা অর্থহীন

কর্পূর দেশের রাজা প্রজাদের আপন সন্তানের মত ভালবাসতেন। তবে তাঁর মধ্যে একটা বিরাট আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি তাঁর দেশের পরিধি ক্রমাগত বাড়াতে চাইতেন। একের পর এক দেশের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ লেগেই থাকত। রাজা ইন্দ্রসেন বলতে যে কোন দেশের রাজা ভয় পেতেন। আবার কর্পূর দেশের প্রজারা রাজা ইন্দ্রসেন বলতে অজ্ঞান ছিল। ইন্দ্রসেনের রাজত্বে কোন প্রজাই দুঃখে ছিল না। কোন পরাজিত দেশের প্রজাই রাজা ইন্দ্রসেনকে অশ্রদ্ধা করত না। তার রাজত্বে প্রত্যেকেই ভাল ছিল।

রাজা ইন্দ্রসেনের এত নামডাক সত্ত্বেও তাঁর নিজের মন্ত্রী সুদর্শন কিন্তু তাঁর রাজকর্ম ভাল চোখে দেখতো না। যুদ্ধের ফলে অসংখ্য মানুষ মারা যেত, প্রচুর অর্থ নষ্ট হত। এর ফলে মন্ত্রী সুদর্শন ভীষণ কষ্ট পেত। এত প্রাণের ও অর্থের অপচয় তার মনকে পীড়িত করত। মনে মনেই সে ব্যথা পেত প্রকাশ্যে তো দূরের কথা গোপনেও রাজাকে বলার সাহস ঐ মন্ত্রীর ছিল না। যে রাজা সারা বিশ্ব জয় করতে চান তাঁর কর্মধারার বিষয়ে কোন রকম কটাক্ষ্য করা সহজ নয়। বুকের পাটা চাই। মন্ত্রীর তা ছিল না। কারণ মন্ত্রী সুদর্শন বুঝে ছিল যে রাজাকে কোন বিষয়ে বলতে গেলে, কোন রকম বিরোধীতা করতে গেলে মন্ত্রীর পদ থেকেতো উৎখাত হতেই হবে, এমন কি মৃত্যুও বরণ করতে হতে পারে।

রাজা ইন্দ্রসেন সবে লাক্ষণিকা দেশ জয় করলেন। ঐ দেশের রাজা সুলক্ষণ ইন্দ্রসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে না পেরে, শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়ে পাশের

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

দেশে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ঐ দেশের নাম সৌগন্ধিক। রাজার নাম ভীমসেন। সৌগন্ধিক দেশ ছিল বিরাট আয়তনের। ঐ দেশের মানুষ রাজার কথা মত চলত। প্রজাদের দিকেও রাজার বিশেষ নজর ছিল। তাঁর বিরাট এক সেনাবাহিনী ছিল। এতখানি ক্ষমতার অধিকারী হয়েও রাজা ভীমসেন শান্তিকামী ছিলেন। কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশের সীমানা বাড়ানোর কোন ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। তাঁর অসীম ক্ষমতার খবর আশপাশের দেশের রাজারা গুপ্তচরদের মাধ্যমে রাখত।

অন্য দিকে ইন্দ্রসেন রাজা হওয়ার পর থেকে প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন ভীমসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হওয়ার। এত বছর পরে একটা বিরাট অজুহাত ইন্দ্রসেন পেলেন। ভীমসেন কেন সুলক্ষণকে আশ্রয় দিলেন। এই হল তাঁর রাগ। ইন্দ্রসেন দূতের মাধ্যমে খবর পাঠালেন যাতে ভীমসেন সুলক্ষণকে তাঁর হাতে অর্পণ করেন। রাজা ভীমসেন তাতে রাজী হলেন না। রাজা ইন্দ্রসেন যেন ঠিক এই ধরণের সুযোগের অপেক্ষাই করছিলেন। তিনি গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি তীব্রতর করছিলেন। লাক্ষণিক দেশে ভীমসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ঘাঁটি তৈরি করলেন। গুপ্তচরদের নেতা চারুদত্তের নেতৃত্বে গুপ্তচরদের পাঠালেন সৌগন্ধিক দেশে।

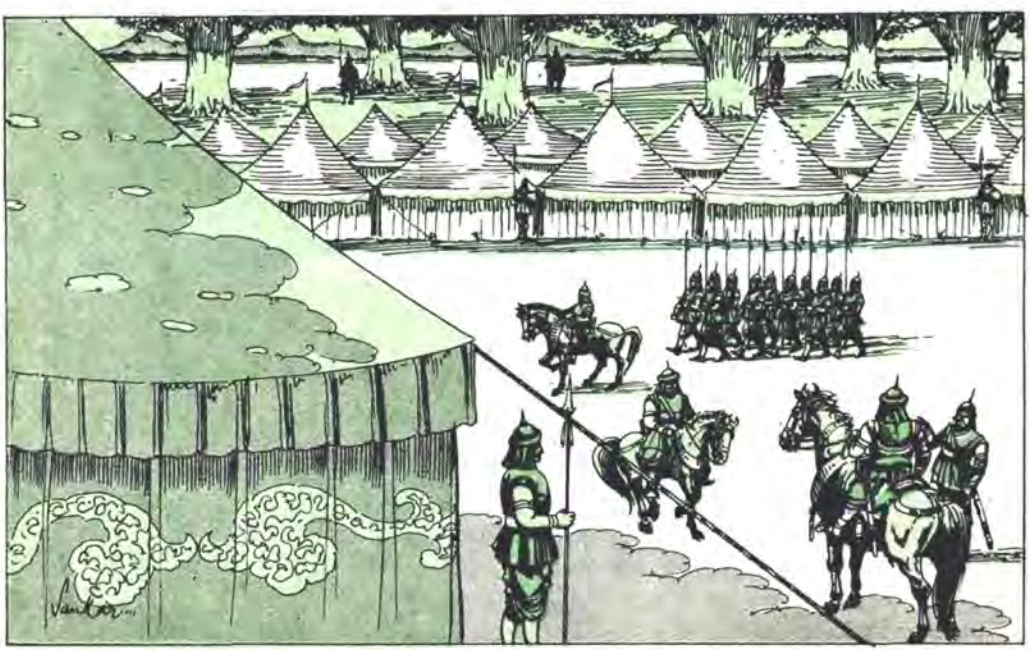

রাজা ইন্দ্রসেন যখন এসব করছিলেন তখন স্বাভাবিক কারণেই ভীমসেন হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন না। তিনি তাঁর দক্ষ গুপ্তচরদের মাধ্যমে অনেক আগেই খবর পেয়ে ছিলেন যে ইন্দ্রসেন তাঁর রাজ্য আক্রমণ করার আশা পোষণ করেন। লাক্ষণিক দেশ জয় করে সেখানেও যে ইন্দ্রসেন যুদ্ধের ঘাঁটি করেছেন তাও ভীমসেনের কাছে অজানা ছিল না। এসব খবর পেয়ে ভীমসেন তার যোগ্য গুপ্তচর নেতা রুদ্রকে লাক্ষণিক দেশে পাঠালেন। রুদ্র লাক্ষণিক দেশে যাওয়ার আগে রাজা সুলক্ষণের সঙ্গে দেখা করে তাঁর দেশে তাঁর প্রিয় ও বিশ্বাসী মানুষ কারা আছে তা জানতে চাইলেন। সুলক্ষণ কয়েকজনের নাম করলেন। কিন্তু কার্যত সুলক্ষণের ঐ সব মিত্রদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া গেল না। তার কারণ আছে।

রাজা ইন্দ্রসেন দেশ জয় করে শাসনতন্ত্র চালু রাখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদে যারা ছিল তাদের সবাইকে সরালেন। প্রজাদের নিজের দেশের প্রজার মতই ভালবাসলেন। ফলে প্রজারা ইন্দ্রসেনের ভক্ত হয়ে উঠল। প্রজাদের এই অবস্থা দেখে আগে যারা সুলক্ষণের ভক্ত ছিল তারা রাতারাতি সব ইন্দ্রসেনের ভক্ত হয়ে গেল। রুদ্র ইন্দ্রসেনের হাতে ধরা পড়ল।

বন্দী রুদ্রের মুখ থেকে সৌগন্ধিক দেশের যুদ্ধ প্রস্তুতির ব্যাপারে নানা খবর জানার আপ্রাণ চেষ্টা করেও কোন লাভ হল না। মন্ত্রীও রাজার সঙ্গে থাকল। রুদ্র প্রথম থেকেই নিজেকে লাক্ষণিক দেশের প্রজাবলেই পরিচয় দিতে লাগল।

জিজ্ঞসাবাদের সময় বারবার একই কথা রুদ্রের মুখে শুনে রাজা ইন্দ্রসেন ভীষণ চটে গিয়ে মন্ত্রীকে বললেন, "এই রাজদ্রোহীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিন।"

শুনে মুখ টিপে হেসে রুদ্র বলল, "আপনি আমাকে রাজদ্রোহী বলছেন কিন্তু যে বাড়িতে ধরেছেন সেই বাড়িতে

তিন যুগের রাজদ্রোহী ছিল।

"আজেবাজে কথা ছেড়ে এখন আসল কথা বল।" বললেন ইন্দ্রসেন।

রুদ্র হেসে বলল, "ঐ বাড়িতে এক বৃদ্ধ আছেন। তাঁর কালেই এই দেশের শাসক ছিলেন সূর্য বংশের রাজারা। তারপর যুদ্ধ হল। চন্দ্রবংশের রাজাদের হাতে গেল এই দেশ। বৃদ্ধ চন্দ্রবংশের রাজাদের ভক্ত হিসেবে গণ্য হলেন। তাহলে তখন এই বৃদ্ধ সূর্যবংশের কাছে রাজদ্রোহী হলেন। তারপর চন্দ্রবংশের রাজাকে পরাজিত করেছিলেন রাজা সুলক্ষণের বাবা। বৃদ্ধ তারপর সুলক্ষণের বাবার সেবা করে রাজভক্ত হলেন। তখন তিনি নিশ্চয় চন্দ্রবংশের রাজাদের কাছে রাজদ্রোহী। এখন আমাকে ধরিয়ে আপনার ভক্ত বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন। তাহলে বৃদ্ধ কি রাজা সুলক্ষণের কাছে রাজদ্রোহী নন?"

শুনে ইন্দ্রসেন বললেন, "অন্যের কথা যাই হোক। তুমি যে রাজদ্রোহী সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।"

"ধরা পড়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি ছিলাম রাজভক্ত। রাজভক্ত ও রাজ-দ্রোহীর মধ্যে মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যবধান।" বলল রুদ্র।

"মহারাজ কালচক্রের পিছনের দিকে ঘোরার অপেক্ষা করতে হবে না। অন্য এক পথ আছে। আপনি তার আগে এই লেখা পড়ুন।" বলে মন্ত্রী রাজার হাতে

একটি কাগজ দিলেন।

ঐ কাগজ পড়ে ইন্দ্রসেন কেমন ঘাবড়ে গেলেন! শ্রেষ্ঠ গুপ্তচর চারুদত্ত ভীমসেনের হাতে ধরা পড়ল! ভীমসেন লিখে জানাচ্ছেন যে কোন রকম অত্যাচার না করে যদি রুদ্রকে অবিলম্বে ছাড়া হয় তাহলে চারুদত্তকেও ছাড়া হবে।

"তাহলে কি করা যায়?" ইন্দ্রসেন তাঁর মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন।

"রুদ্রকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া পথ নেই মহারাজ।" মন্ত্রী বলল।

"আপনি যে বললেন তাকে রাজভক্ত হিসেবে রূপান্তরিত করা যায়?" ইন্দ্রসেন বললেন।

"আমাদের দেশের সীমা পেরিয়ে গেলেই রুদ্র রাজভক্ত হয়ে যাবে। রাজভক্ত ও রাজদ্রোহীর মাঝে একটি সীমা রেখা আছে। এই রেখাই মস্ত বড় বাধা।" বলল মন্ত্রী সুদর্শন।

"তাই নাকি? তাহলে আমি যে সব যুদ্ধ করছি তার কোন...?" ইন্দ্রসেন কথা শেষ করার আগেই মন্ত্রী সুদর্শন বলল, "কোন প্রয়োজন নেই মহারাজ। প্রজাদের কাছে দেশ শাসনই প্রধান, শাসক নয়। যে কোন দেশে সাধারণ প্রজা খেয়ে পরে বাঁচতে চায়। নিজের দেশ পরের দেশ শব্দগুলোও অর্থহীন। যুদ্ধ করে, অসংখ্য মানুষকে যুদ্ধে ঠেলে দিয়ে, আপনি সৌগন্ধিক দেশ দখল করতে চাইছেন। দখল করেও কিছুই হবার নয়। কী চান আপনি ঐ দেশের মানুষের ভালবাসা? তার জন্যে তো সুন্দর পথ আছে। সৌগন্ধিক দেশের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন।" বলল মন্ত্রী সুদর্শন।

মন্ত্রীর কথাগুলো ইন্দ্রসেনের কানের ভিতর দিয়ে মনে গেঁথে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি রুদ্রকে ছেড়ে ভীমসেনের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করলেন। চারুদত্ত সত্যি সত্যি ধরা পড়েনি ভীমসেনের হাতে। তবে মন্ত্রী সুদর্শন যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন তা রাজা ইন্দ্রসেন কোনদিন জানতে পারেন নি।

# শিক্ষকের শাস্তি

এই কাহিনীর ভিত্তি চল্লিশ বছর আগেকার এক সত্য ঘটনা। এক বস্তির বিদ্যালয়ে রেভারেণ্ড আরুলস্বামী শিক্ষকতা করতেন। ছাত্রদের প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল গভীর। ছাত্ররাও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। উনি অঙ্ক করাতেন। আমি অঙ্ক কষতে পারতাম না। ভাল লাগত না। কিন্তু আমারও ঐ মাস্টার মশাইকে খুব ভাল লাগত।

একদিন ক্লাসে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেল। আগের দিন বাড়িতে করার জন্য মাস্টার মশাই সবাইকে চারটে অঙ্ক দিয়েছিলেন। সেদিন একজন বাদে সবাই অঙ্ক করে এনেছিল। অঙ্ক করে আনতে পারেনি বলে তার কোন লজ্জা বা সংকোচ ছিলনা।

সেদিন আরুলস্বামী একধার থেকে সকলের অঙ্ক দেখে নম্বর দিতে লাগলেন। ঐ ছেলেটির পালা যখন এলো তখন সে সোজা জানিয়ে দিল যে সে অঙ্ক করেনি। "করনি কেন? এই অঙ্ক পারনা?" আরুলস্বামী জিজ্ঞেস করলেন।

"পারি, কিন্তু করে আনতে পারিনি।" ছাত্র বলল।

"যাও হেড মাস্টার মশাইয়ের ঘর থেকে বেত নিয়ে এসো।" মাস্টার মশাই বললেন। ছাত্রটি বেত নিয়ে এল। মাস্টার মশাই তাকে ক্লাসের বাইরে দাঁড় করালেন। আমরা সবাই বুঝতে পারছিলাম যে সে ভীষণ মার খাবে। বেত তখনও ছাত্রের হাতে।

মাস্টার মশাই হঠাৎ তার সামনে হাত পেতে বললেন, "বাড়িতে করার জন্য অতগুলো অঙ্ক দিয়ে খুব অন্যায় করেছি। নে মার, আমায় শাস্তি দে।

ছাত্রটি কাঁপতে কাঁপতে মাস্টার মশাইর হাতে বেত ছুঁইয়ে হাউমাউ করে কেঁদে তাঁর পায়ে আছড়ে পড়ে ক্ষমা চাইল।

—এম্. দত্তপাণি



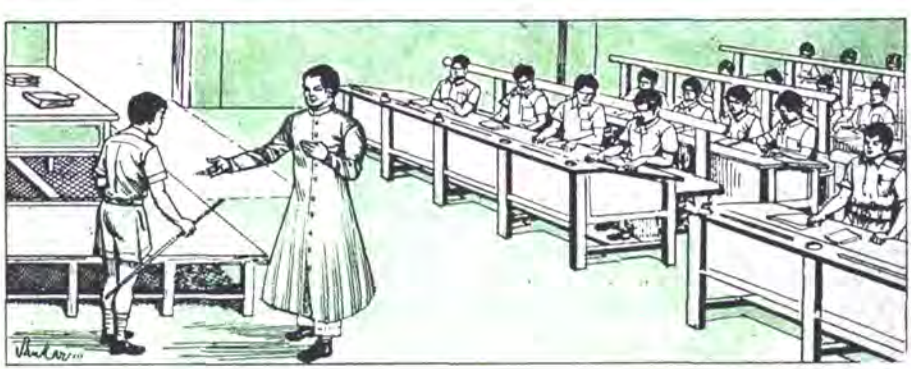

# ধার শোধ

কোন এক গ্রামে অতি লোভী একজন ছিল। তার বাড়ির ছাদে একটা পাখি বসলেও সে সহ্য করত না। অনেক টাকাপয়সা গয়নাগাটি জমিয়েও সে দীন দরিদ্রের মত থাকত।

রঘুনাথের বউ খেতে না পেয়ে অসুখে ভুগে মারা গেল। তার এক ছেলে ছিল বুদ্ধিতে বৃহস্পতি। ছেলেটিকে রঘুনাথ ভিখীরির মত এক মুঠো ফেন ভাত খাওয়াত। না খেতে পাওয়ায় হাতে যখন তার পয়সা পড়ত, গোপনে দোকানে গিয়ে যা পেত তাই খেয়ে নিত কিনে।

পয়সা জমিয়ে রাখার অদ্ভুত এক জায়গা ছিল রঘুনাথের। ঘরের কোণে একটি কলসি পুঁতে রেখেছিল মাটির তলায়। তার মুখে শুধু পয়সা গলিয়ে ফেলার মত ছোট্ট ছিদ্র ছিল। এমনভাবে কলসিটা রেখেছিল যাতে কারো নজর না পড়ে। খাওয়া পরার জন্য সামান্য কিছু খরচ করে বাকি সবটাই ঐ কলসিতে জমিয়ে রাখত।

বাবাকে ঘরের এক কোণে পয়সা ফেলতে দেখে ছেলে বুঝতে না পেরে তাকে জিজ্ঞেস করল, "কি করছো বাবা? সব পয়সা এভাবে মাটির তলায় ফেলে দিচ্ছ কেন? সন্ধ্যের সময় এক মুঠো খুদ কেনার পয়সাও রাখবে না? রাত্রে খাব কি?"

রঘুনাথ ছেলেকে বলল, "দেখ বাবা, মাটির তলায় এমনি এমনি পয়সা ফেলছি না। মাটি আমাদের কাছ থেকে অনেক টাকা পাবে। এত ঋণ আমরা এক সঙ্গে শোধ করতে পারবো না। তাই প্রত্যেক দিন অল্প অল্প করে শোধ করছি। যতই ঢালছি ততই আমার ঋণের বোঝা কমে যাচ্ছে।"

উৎপল দত্তরায়

বাবার এই কথাগুলো ছেলে বিশ্বাস করে ভাবল, বাবাকে এই ভাবে ঋণ শোধ করতে হচ্ছে বলেই আমরা দুবেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছি না। ওদের উপর ছেলেটির খুব রাগ হল। সে বাবাকে বলল, "ওদের জন্য আমাদের এত কষ্ট করার কি দরকার? ওদের না দিলে কি হয়? কি করবে ওরা? কাল থেকে আর দিও না। ওরা কি ওখানেই সব সময়, দিন নেই রাত নেই ঠায় বসে আছে?"

ছেলের কথা শুনে রঘুনাথ ঘাবড়ে গেল। কি বলবে ভেবে না পেয়ে হক-চকিয়ে যা মুখে এল তাই বলল, "বলিস কিরে বাবা? ওরা কি সাধারণ লোক নাকি? আমরা যদি একদিন পয়সা না দি ওরা বড় বড় ছোরা নিয়ে আমাদের মেরে ফেলতে তেড়ে আসবে। ওরা ভীষণ, ভয়ঙ্কর। ওদের দেখলেই আমরা অজ্ঞান হয়ে যাব। কি কালো কালো বিরাট বিরাট চেহারা ওদের। লম্বা লম্বা হাত, ছোরার মত দাঁত।"

রঘুনাথের ছেলের মনে বাপের কথা-গুলো গেঁথে গেল।

শীতকাল। রাত্রে খাবার সময় এক সাধু এসে বলল, "কে আছে বাবা ঘরে। আজ রাত্রের মত আমায় এক মুঠো অন্ন

দান কর।" বলতে বলতে সাধু দরজার কড়া নাড়তে লাগল।

কড়া নাড়ার শব্দ শুনে রঘুনাথ ভীষণ রেগে গিয়ে চিৎকার করে বলল, "এটা তোমার দাদুর তৈরি ধর্মশালা নয়।"

"বাবু, খেতে এক মুঠো না দেন না দেবেন। আজ রাত্রের মত আপনার এই বারান্দায় একটু ঘুমোতে দিন। খুব শীত পড়েছে। আমি এখানে নতুন এসেছি। পথ ঘাট চিনি না।" সাধু বলল।

"তা আমি কি করব? যেতে বলছি যাও। খেতেও দেব না থাকতেও দেব না।" বলতে বলতে ধাক্কা দিয়ে বলল রঘুনাথ, "বলি আমরা কি তোমার কাছে

দাসখত দিয়েছি যে যখন তখন তুমি আসবে আর আমরা তোমায় খেতে দেব, থাকতে দেব। ইস্ কি আমার একাল সেকালের পাওনাদার রে ?"

"আমি পাওনাদার না হই, কেউ না কেউ তো আছেই। আছে বলেই তো এক মুঠো ভাত দিতে তোমার এত কষ্ট হচ্ছে। যা কিছু জমাচ্ছ সব তো পরের হবে। জমিয়ে কি করবে ? এক পয়সাও তো পাবে না।" বলতে বলতে সাধু চলে যাবে এমন সময় তেড়ে এসে রঘুনাথ বলল, "তোমার মত পাজি লোককে যখন তখন খাওয়াতে পারলেই ভাল লোক হয়ে যাব। আজকে রাতটা পথে ঘাটে কাটাও না কেন। বুঝবে পয়সা জমানো কেন দরকার। টাকাপয়সা জমানো অত সহজ নয়।"

"সবাই বুঝবে। সময় এলে তুমিও বুঝবে। একদিন না একদিন সবাইকে বুঝতে হবে।" সাধু বলল।

"শকুনির অভিশাপে গরু মরে না। আমার বিরাট বাড়ি আছে। পয়সা আছে। সেরকম দুদিন আমার কোন-দিনই আসবে না।" বলে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল রঘুনাথ।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে তিনদিনের জন্য এক জায়গায় যেতে হল রঘুনাথকে। যাওয়ার আগে সে ছেলেকে বলল, "ওরে বাবা শোন, প্রত্যেক দিন ঐ ফুটো দিয়ে পয়সা চালবি। দরজা ঠিক মত বন্ধ করে শুবি। রাত্রে ঐ খানেই বিছানা করবি। আমি তিন দিনের মধ্যেই ঘুরে আসছি। খুব সাবধান। ঘর খোলা রেখে একটুও এদিক ওদিক যাবি না। যে যা পয়সা কড়ি দেবে, খাবার জন্য সামান্য কিছু রেখে বাকি সবটাই ঐ ফুটো দিয়ে ফেলে দিবি।"

রঘুনাথের ছেলে বাপের সব কথাতেই মাথা নেড়ে রাজী হয়ে গেল। কিন্তু পরে যত পয়সা হাতে পড়ল মনের আনন্দে সব খরচ করতে লাগল। এর আগে এত

পয়সা কোন দিন তার হাতে পড়েনি।

দুদিন পরে মাঝ রাতে কড়া নাড়ার শব্দ শুনে বাপ এসেছে ভেবে রঘুনাথের ছেলে দরজা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন চোর বড় বড় ছোরা হাতে ঘরে ঢুকলো। ওদের দেখেই রঘুনাথের ছেলের মনে পড়ে গেল বাপের সেই কথা। মাটির তলায় যে পাওনাদাররা আছে তারা তো কালো কালো বড় বড় ছোরা হাতে টাকা আদায় করতে আসতে পারে। সে যে দুদিন ঐ ফুটোতে পয়সা ঢালেনি সে-জন্যই ওরা এসেছে। রঘুনাথের ছেলে জোড় হাত করে ওদের বলল, "প্রভু, হে পাওনাদারগণ, হাতে বেশি পয়সা না আসায় মাটির তলায় আমি পয়সা ফেলতে পারিনি। বাবা থাকলে কিছু না কিছু না ঢেলে ঘুমোতে পারতেন না। আজকের মত আমাকে ক্ষমা করুন। কাল একসঙ্গে তিন দিনের টাকাপয়সা ঢেলে দেব।"

ওর কথা চোরদের কাছে অর্থহীন লাগছিল। তিনজনের মধ্যে একজন চোর ওকে বলল, "কোই দেখাওতো কোথায় তোমার বাবা পয়সা ঢালে? অনেক দিন আমরা পাচ্ছি না। অথচ বলছ রোজ তোমার বাবা পয়সা ঢালছেন?"

রঘুনাথের ছেলে দেখাল ঐ জায়গাটা। চোরগুলো মাটি খুঁড়ে টাকা পয়সা জমানোর কলসি তুলে নিয়ে গেল।

পরের দিন রঘুনাথ ফিরে এসে ঐ জায়গাটায় বিরাট গর্ত দেখে বুক চাপড়ে অর্তনাদ করে উঠল, "ওরে আমার কলসি কোথায় গেল রে।"

"এমন ভাবে চেঁচাচ্ছে যেন বাড়িতে চোর পড়েছে। অত ঘাবড়াবার কি আছে? যাদের টাকা তারাই নিয়েছে। চোরে নেয়নি।" রঘুনাথের ছেলে বলল।

রাগে রঘুনাথ ছেলের গলা টিপে ধরে বলল, "আমার নয়তো টাকাটা কার? কোন পাওনাদারের?"

"ঐ তো কালো কালো লোক ছোরা হাতে। ওরাই তো তোমার পাওনাদার। ওরাই এসেছিলো।" রঘুনাথের ছেলে গলায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল।

"ওরে ব্যাটা মূর্খ পাঁঠা। ওরা পাওনাদার নয়, ওরা চোর—চোর।" রঘুনাথ নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে আর্তনাদ করে বলল।

রঘুনাথের ছেলের তখনও ঘোর কাটল না, কিছু বুঝল, কিছু বুঝল না। তবে মনে মনে ঠিক করল আর কোনদিন রাত্রে দরজা খুলবে না।

বিচারকের কাছে রঘুনাথ গেল না। তার ভয় হল পাছে লোক জেনে যায় যে তার কাছে টাকা ছিল। সে নিজেই চোর ধরতে গভীর রাত্রে ঘুরে বেড়াতে লাগল। একদিন ঘুরে ঘুরে কোন চোরের পাত্তা না পেয়ে গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরল। ছেলের নাম ধরে ডাকল দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে। ছেলে ভাবল আবার চোর এসেছে। ঘুমের ঘোরে সে চোরের কথা ভাবছিল। নিশ্চয় চোর তার বাবার গলা নকল করে ডাকছে।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও যখন দরজা খোলানো গেল না, তখন সেই শীতে কোথায় রাত কাটাবে ভেবে না পেয়ে এ-বাড়ি ওবাড়ি পাগলের মত ঘুরতে লাগল। ভোরে শীতে জড়সড় হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি ফেরার সময় ঐ সাধু তার সামনে পড়ে গেল। সাধু তাকে বলল, "কি হলো? তোমার না বিরাট বাড়ি আছে, অনেক টাকা আছে? শীতে কাঁপছ কেন? পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন, এই অন্ধকার ভোররাত্রে?"

"তোমার অভিশাপ লেগেছে। আমার সব জমানো টাকা চোর নিয়ে গেছে।" রঘুনাথ বলল।

সাধু বলল, "ওরা চোর নয়, তোমার পাওনাদার। নিয়ে গেছে ভাল হয়েছে।"

তারপর থেকে রঘুনাথ খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কিপটেমি করেনি। দানধর্মও করত যখন তখন।

# মাহাত্ম্য

একদিন সকালে এক নগরে একজন মোটা লোক ঢুকল। অত লম্বা অত মোটা লোক পৃথিবীতে থাকতে পারে তা তাকে না দেখলে বিশ্বাস হত না। সে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছিল তার শরীর। হাতে বাঁধা ছিল একটা বিরাট মাদুলি। তাকে দেখেই বাচ্চারা ছুটে পালিয়ে গেল ঘরে। মেয়েরা দরজা বন্ধ করে দিল।

সে অত্যন্ত কষ্টে হাঁটছিল এক পা এক পা করে। আর চিৎকার করে বলছিল, "মাদুলির মাহাত্ম্য যদি জানতে চান চলে আসুন আমার কাছে।" কিন্তু তাকে লোকে তান্ত্রিক ভাবল। কেউ তার কাছে এলো না।

একজন এলো। সারাদিন সে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াত। তার নাম মাধাই। সে ছুটে এলো ঐ মোটা লোকটার কাছে। তাকে বলল, "মাদুলির মাহাত্ম্য কি আমি তা জানতে চাই। নিজের চোখে না দেখে আমি বিশ্বাস করতে পারব না।"

মোটা লোকটা একবার তার দিকে তাকিয়ে বলল, "এসো আমার সঙ্গে।" বলে লোকটা মাধাইকে শহরের শেষ-প্রান্তে নিয়ে গেল।

সেখানে এক বট গাছের নিচে সে নিজের মাদুলিটা খুলল। খোলার সঙ্গে সঙ্গে মাদুলিটা সাধারণ মাদুলির মত ছোট হয়ে গেল।

"এই নাকি মাদুলির মাহাত্ম্য?" মাধাই জিজ্ঞেস করল।

"অত অস্থির হওয়ার কি আছে? এখনও তো কিছুই দেখনি। আমার এই মাদুলিটা তোমার হাতে বেঁধে, তোমার নাগালের বাইরে চলে গেলে, এর মাহাত্ম্য বুঝতে পারবে। তুমি যদি এর হাত

পরমানন্দ ভট্টাচার্য

থেকে কোন দিন কোন কারণে নিস্তার পেতে চাও তাহলে তুমি অন্য কোন লোকের হাতে বেঁধে দিও।" বলতে বলতে মোটা লোকটা চলে গেল। মাধাই আরও কি যেন প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগে সে অনেক দূর চলে গেল।

ওর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে সে নিজের মাদুলির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। মাদুলিটা যে মুহূর্তে এত বড় হয়ে যাবে তা সে ভাবতে পারে নি। সেখানেই বিস্ময়ের শেষ নয়। সে টের পাচ্ছিল তার শরীরটা ক্রমশ লম্বা চওড়া হয়ে যাচ্ছে।

নিজের কাছে নিজেকে তার অচেনা লাগছিল। মাধাই তার বিপুল দেহটাকে নিয়ে দুঃখ করতে করতে যখন সে হাঁটছিল তখন সে দেখতে পেল একটা রোগা লোক একটা চাদর গায়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

মাধাইকে তার বাড়ির কাছের লোক, যারা তাকে চিনেছিল, তারা সব কথা শুনে বলল, "আমরা আগেই বুঝেছিলাম ঐ মাদুলিতে কোন গোলমাল আছে। তুমি এখনও ঐ মাদুলি বেঁধে রেখেছ? ছিঁড়ে ফেলে দাও। ও সব মারাত্মক জিনিস রাখতে নেই।"

ওদের কথা শুনে মাধাই মাদুলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। পরমুহূর্তেই ঐ মাদুলি উঠে এসে মাধাইয়ের হাত যেন জড়িয়ে ধরল।

মাদুলিটা যেখানে লাগছিল সেখানেই মনে হচ্ছিল যেন আগুনের ছ্যাঁকা লাগছে। ওটা ফেলে দেওয়া বা ছিঁড়ে ফেলার চিন্তা ছেড়ে দেওয়ার পর তার ছ্যাঁকা লাগাও বন্ধ হয়ে গেল।

মাধাইয়ের আর একটা সমস্যা দেখা দিল। যতই খাক না কেন পেট তার ভরে না। রাক্ষুসে খিদে পায়। ঐ বিরাট দেহ নিয়ে কাজ করতে পারে না অথচ খিদেও পায়। নিজের সব কিছু বিক্রি

করে খাওয়ার পেছনেই খরচ করল। দিন কয়েকের মধ্যেই সে নিঃস্ব হয়ে গেল। শেষে সে দূরের এক বটগাছের নিচে বসে কি ভাবে আত্মহত্যা করবে তাই ভাবছিল।

অনেকক্ষণ পরে অন্য জায়গার লোক সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে মাধাইকে জিজ্ঞেস করল, "দেখুন আমি কত খাই কিন্তু আমার শরীর এই রকম রোগা পট্‌কাই থাকে। আপনি জানেন কি ভাবে মোটা হওয়া যায়? আমার এই রোগা শরীরের জন্য বিয়ে হচ্ছে না।" বলল লোকটা। তার নাম বিভূতি।

"এই মাদুলি দিয়ে মোটা হওয়া যায়।" বলল মাধাই।

মাধাইয়ের ধড়ে যেন প্রাণ এলো। সে তৎক্ষণাৎ মাদুলি খুলে ওর হাতে পরিয়ে দিল। তারপর মাধাই যেতে যেতে বিভূতিকে বলল, "আমি যখন তোমার নাগালের বাইরে চলে যাব তখন তুমি এই মাদুলির মাহাত্ম্য বুঝতে পারবে। তুমি যদি এর মাহাত্ম্য থেকে মুক্তি পেতে চাও তাহলে অন্যের হাতে এটা পরিয়ে দিতে পার। ফেলে দিলে কিন্তু তোমার গা পুড়ে যাবে।" বলে মাধাই তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে গেল।

তার চলে যাওয়ার পর বিভূতি ক্রমশ মোটা হতে লাগল।

এত মোটা হয়ে গেল যে তার কপালে আর মেয়ে জুটল না। তখন সে কোন

রকমে মাদুলির হাত থেকে মুক্ত হতে চাইল।

যতই খাক না কেন তার পেট ভরত না। শেষে উদর পূরণের জন্য তাকে ভিক্ষে করতে হল।

একদিন ভিক্ষে করতে করতে একটা বাড়িতে গেল।

সে বাড়িতে এক কুমারী মেয়ে ছিল। মেয়েটি এত মোটা লোককে দেখে অবাক হয়ে গেল। ভাবল, ভগবানের কি বিচার। এই লোকটাকে এত সুন্দর মোটা করেছে, আর আমাকে এত রোগা করেছে যে আমার বিয়ে হচ্ছে না। সে বিভূতিকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি এত সুন্দর মোটা হলেন কি করে? আমার দেখুন শরীরের কি হাল হয়েছে। হাড় বেরিয়ে গেছে। আমার এই রোগা শরীরের জন্য কেউ আমাকে পছন্দ করছে না। আমার বিয়ে হচ্ছে না। মোটা না হতে পারলে জীবন আমার বিফলে যাবে।"

"আমার এই মাদুলি দিয়ে তুমি আজকেই মোটা হতে পারবে। নাও হাত বাড়াও। পরিয়ে দিচ্ছি। একটা কথা মনে রেখ, আমি যতক্ষণ না তোমার নাগালের বাইরে যাচ্ছি ততক্ষণ তুমি এই মাদুলির মাহাত্ম্য বুঝতে পারবে না। আর তুমি যদি এর মাহাত্ম্য থেকে মুক্তি পেতে চাও তাহলে অন্যের হাতে এটা পরিয়ে দিও। ফেলে দিলে কিন্তু তোমার গা পুড়ে যাবে।" বলে বিভূতি দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেল।

কুমারী মেয়েটি বাড়িতে ঢুকে নিজের রূপ দেখার জন্য বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চমকে উঠল।

দাঁড় করানো আয়নায় তার শরীরের চার ভাগের এক ভাগও দেখা গেল না। তার শরীর এত বিরাট আয়তনের হয়ে গেল।

সে কাঁদতে লাগল। অত মোটা কুমারী মেয়েকে দেখার জন্য চারদিক থেকে লোক আসতে লাগল। যে দেখে সেই

হাসে।

ওদের মধ্যে সেই দেশের রাজকুমারীর পরিচারিকাও ছিল। সে ঐ কুমারী মেয়েকে বলল, "দেখ আমাদের রাজ-কুমারী চার বছরের মধ্যে হাসে নি। তোমাকে দেখলে ও নিশ্চয়ই হাসবে। তুমি চল আমার সঙ্গে।" বলে তাকে সে রাজকুমারীর কাছে নিয়ে গেল।

রাজকুমারী তখন উদ্যানের একটি গাছের নিচে বসে গালে হাত দিয়ে কি যেন ভাবছিল। ঐ বিরাট দেহী কুমারীকে দেখে রাজকুমারী হো হো করে হেসে উঠল।

"অনেক বছর পরে তুমি আমাকে হাসাতে পারলে। তোমার মধ্যে কি মাহাত্ম্য আছে বল দেখি ?" রাজকুমারী বলল।

"আমার কোন মাহাত্ম্য নেই। যা কিছু মাহাত্ম্য তাহল এই মাদুলির।" কুমারী মেয়েটি বলল।

"দেখি মাদুলিটা আমায় দাও তো ? দেখি, কি মাহাত্ম্য আছে দেখি ?" রাজকুমারী বলল।

"এমনি হাতে নিয়ে কিছু বুঝবেন না। কমরে বা হাতে পরলে বুঝতে পারবেন।" বলতে বলতে কুমারী রাজকুমারীর হাতে মাদুলিটা বেঁধে দিল।

"এর হাত থেকে যদি মুক্তি পেতে চান তাহলে অন্যের হাতে এটা বেঁধে দেবেন।" বলে কুমারী সেখান থেকে

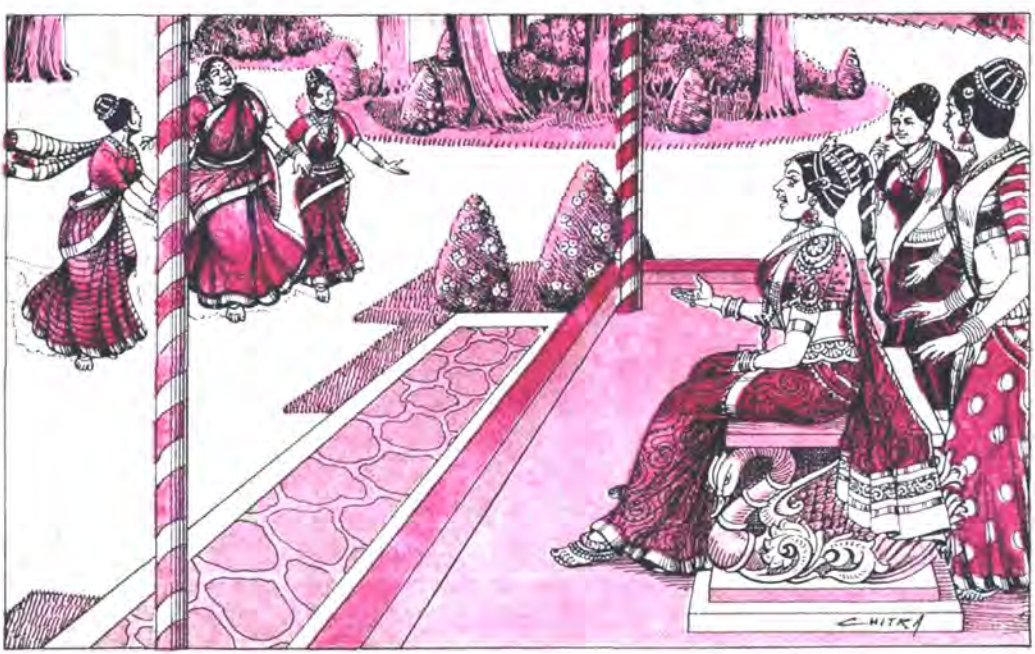

পালিয়ে বাঁচল।

রাজকুমারী মাদুলি পরে পালকিতে উঠে রাজমহলের দিকে এগোতে লাগল। পালকি বাহকদের কাছে ক্রমশ ভারি লাগছিল। আর ঠিক তখনই পালকির ভেতর থেকে রাজকুমারী আর্তনাদ করে উঠল। পরমুহূর্তেই পালকি ভেঙ্গে রাজকুমারী নিচে পড়ে গেল।

তারপর পরিচারিকারা তাকে আস্তে আস্তে এক পা এক পা করে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল রাজপ্রাসাদে।

বাবাকে দেখে রাজকুমারী হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল। আগাগোড়া যা ঘটেছিল বলল।

রাজার একমাত্র কন্যার এই অবস্থা দেখে রাজার তো বটেই রাজকর্মচারী-দেরও খুব দুঃখ হলো। রাজকুমারী মাদুলি খুলে ফেলে দিল। কিন্তু পরক্ষণেই সেটা রাজকুমারীর হাতে লগ্ন হলো।

মেয়ের এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে রাজা নিজেই ওটা হাতে পরে নিল। রাজকুমারীর চেহারা আগের মত ছিম-ছাম সুন্দর হয়ে গেল।

রাজা মোটা হওয়ার পর খাওয়ার অসুবিধা হল না বটে কিন্তু কাজ কর্মের খুব অসুবিধা হতে লাগল। পোষাক থেকে মুকুট পর্যন্ত সবই বদলাতে হলো।

অনেক ভেবে রাজা সেই কুমারীকে ডেকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে সেই মাদুলি বিভূতির কাছ থেকে পেয়েছে। বিভূতিকে ডেকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে সেটা সে মাধাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছে। মাধাই যার কাছ থেকে পেয়েছে তার খোঁজ পাওয়া গেল না।

রাজা তখন ঘোষণা করল, "যে এই মাদুলি পরবে তাকে রাজভাণ্ডার থেকে খাদ্য ও থাকার জন্য বাসস্থান দেওয়া হবে।"

তখন মাধাইকে যে লোকটা মাদুলি দিয়েছিল সেই লোকটা এসে মাদুলি ধারণ করে রাজ ভাণ্ডারের খাদ্য খেয়ে রাজার দেওয়া বাসস্থানে থাকতে লাগল।

# ধড়িবাজ দুধওয়ালা

পান্না নামক গ্রামে রাধারমণ নামে এক ধড়িবাজ দুধওয়ালা ছিল। তার বউও ছিল খুব ধূর্ত।

ওরা দুধে আজে বাজে সস্তা জিনিস মিশিয়ে সেই দুধ বিক্রি করত। তার অনেকগুলো গরু মোষ ছিল। অনেক দুধ হত।

তাই লোকে তার কাছে ছুটে যেত দুধ কিনতে। তার পোষা গরু মোষের যত দুধ হত তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি দুধ বিক্রি করত।

ঐ গ্রামে আর এক দুধওয়ালা ছিল। তার নাম নীলু। লোকটার নীতি বোধ ছিল। তার ছিল দুটি গরু ও দুটি মোষ। সে ওদের দুধ বিক্রি করে কোন রকমে দিন যাপন করত।

বন্ধুরা তাকে বলত দুধে জল মেশাতে। কিন্তু সে তা করত না। সে চাইত ন্যায়ের পথে চলতে।

অধর্মের পথে সে রোজগার করতে চাইত না। রাধারমণ যে দামে দুধ বিক্রি করত সে দামে সে বিক্রি করতে পারত না। কারণ তার দুধে ভেজাল ছিল না। নির্ভেজাল দুধ বেশি দামে বিক্রি করেও তার কিছু থাকত না।

তাই তাকে অর্ধেক দিন সপরিবারে না খেয়ে থাকতে হত। যতই কষ্ট হোক সে প্রত্যেক দিন গরু মোষদের চরাত এবং তাতেও তাদের পেট না ভরলে জাবর দিত। গরুর যাতে কোন রোগ না ধরে, যাতে খুব ভাল থাকে সেদিকে তার নজর ছিল।

রাধারমণের অবস্থা ঠিক বিপরীত। দুধ বিক্রি করে সে অনেক টাকা পয়সা করে নিয়েছিল।

গরু মোষদের পেট ভরে খেতে দিত

এ. সি. সরকার (জাদুকর)

না। চরানোরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে তার গরু মোষ ক্রমেই রোগা হয়ে যেত, দুধ কম দিত। কিন্তু তাতে তাদের কোন ক্ষতি হত না।

যতটা দুধ কমে যেত স্বামী স্ত্রীতে মিলে ময়দা বাতাসা জল মিশিয়ে দুধের পরিমাণ বাড়িয়ে দিত।

এই ভাবে তারা প্রত্যেক দিন খদ্দের-দের ঠকাত। রাধারমণের দুধের সাধ যে বদলে যাচ্ছিল, তা কিছু কিছু খদ্দের ধরতে পেরেছিল।

তাদের অভিযোগ শুনে রাধারমণ গুরুগম্ভীর গলায় বলত, "কি বলবো বাবু, এসব কি আপনারা বুঝবেন? আমার গরু মোষ এখন আর মাঠের ঘাস খেতে চায় না। যুগ বদলাচ্ছে আর ওরাও বদলাচ্ছে। বাড়িতে খড় জাবর যা দি শুধু তাই খায়। খড় খেলে দুধের সাধ তো একটু বদলাবেই। তবে কবরেজ বদ্যিদের মতে খড় খাওয়া গরু মোষের দুধই বেশি উপকারী। বিশ্বাস না হয় আমাদের গ্রামের তন্তুশর্মাকে জিজ্ঞেস করুন। গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে সেদিকে তো তন্তুশর্মার চির-কালই খুব নজর। উনি পরীক্ষা করে নিশ্চয়ই যা সত্য তাই বলবেন।"

তারপর সে তন্তুশর্মাকে ঘুষ দিয়ে তার মুখেই গাঁয়ে প্রচার করাল যে খড় খাওয়া গরু মোষের দুধ বেশি উপকারী বলে আয়ুর্বেদ গ্রন্থে লেখা আছে।

তন্তুশর্মার কথা প্রচার হওয়ার পর রাধারমণের খদ্দের আরও বেড়ে গেল। চারদিক থেকে তার রোজগার বাড়তে লাগল। ফলে নীলুর অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে গেল।

গ্রামের এক প্রান্তে চৌধুরীদের বিরাট বাড়ি ছিল। ওরা মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক। একান্নবর্তী পরিবার। ঐ পরি-বারের এক মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে শহর থেকে ওদের বহু আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এসেছিল। ঐতিহ্য সম্পন্ন চৌধুরী

পরিবারের দীনু চৌধুরীর দুই ছেলের নাম রবি ও ছবি।

ওরা দুজনেই খুব চালাক চতুর। বড় ছেলে রবির বয়স আঠার। এই বয়সেই সে যে জাদু শিখেছিল। তা দেখে লোক অবাক হয়ে যেত। এ বিয়ে উপলক্ষ্যে ওরাও শহরের বোর্ডিং থেকে এসেছিল। শহরের মানুষের গ্রাম দেখার একটা কৌতূহল ছিল।

সারাদিন ওরা গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াত।

নানা ধরনের লোকের সঙ্গে আলাপ করত। বাড়িতে এত লোক থাকাতে চৌধুরীদের আরও বেশি দুধ দিতে হয়েছিল রাধারমণকে। রবি ও ছবি তার দুধের স্বাদ পেয়েছিল। ওরা ভেবেছিল গাঁয়ের দুধ ভিন্ন স্বাদের হবে। কিন্তু তা হল না।

এ না হওয়ার কারণ যে কি তাও তারা বুঝতে পারল না।

একদিন ওরা গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেল, একটি লোক দুটি গরু ও দুটি মোষ মাঠে চরাতে চরাতে বাঁশী বাজাচ্ছে।

তার বাঁশীর সুর ঐ সবুজ মাঠে অপূর্ব মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করেছিল। দুই ভাই ওর কাছে গেল। পেছনে দাঁড়িয়ে শুনল।

নীলুর বাঁশী থামার পর রবি তার সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "দাদা আপনি এত সুন্দর বাজাতে কি করে শিখলেন? ঐ সুন্দর মনোরম পরিবেশে নীলুকে করা রবির প্রশ্নের মধ্যে গভীর আন্তরিকতা ও কৌতূহল ছিল। কোথায় শিখলেন?"

"কোথায় আর শিখবো ছোটবাবু? সারাদিন খেটে পেট ভরে না। দুশ্চিন্তা মাথায় জাঁকিয়ে বসে থাকে। সেটাই বাঁশীর ভেতর দিয়ে বের হয়।" নীলু বলল।

"দুশ্চিন্তা? কিসের দুশ্চিন্তা?" রবি জিজ্ঞেস করল।

"দুশ্চিন্তা কি একটা বাবু? পেট ভরানোর খাদ্য নেই, পরিবারের সুখ নেই, আর কত বলব!" নীলু বলল।

রবি নীলুর কাছে তার দুরবস্থার কথা জানতে চাইল। নীলু সব বলল। তার দুধ বেচার কথা। রাধারমণের খদ্দের বেড়ে যাওয়ার কথা এবং তার খদ্দের কমে যাওয়ার কথা।

"রাধারমণের খারাপ দুধের কথা গ্রামবাসীদের জানালে তো হতো?" রবি নীলুকে বলল।

"আমার কথা কে বিশ্বাস করবে বাবু? গ্রামের যে অত বড় বৈদ্য তন্তশর্মা সেও রাধারমণের পক্ষে প্রচার করে। ওর কথা গ্রামবাসীদের কাছে বেদ-বাক্য।" নীলু হতাশার সুরে অসহায় ভাবে বলল।

"তার কারণ কি? তন্তশর্মা কি শুধু বৈদ্য নয়? সে কি অলৌকিক ব্যাপারে কিছু গ্রামবাসীদের দেখায়?" রবি জিজ্ঞেস করল।

"ঠিক ধরেছ বাবু। তন্তশর্মা শুধু যে রোগীদের ওষুধ দেয় তা নয়। তাদের হাতে তাবিজ পরায়, ফুঁ দেয় তাদের গায়ে। তন্তশর্মার বাড়ির সামনে যে বট-গাছটা আছে তাতে অনেকগুলো ভূত পোষে। অমাবস্যার রাত্রে সে ঐ ভূতদের ডাকে, সে ওদের সঙ্গে কথা বলে। তন্তশর্মার এসব কাজ কারবার লোকে যত না দেখে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রচার করে।" বলল নীলু।

"এক গ্লাস দুধ দিতে পার?" রবি জিজ্ঞেস করল।

দুই ভাই সেদিন নীলুর কাছে কিছু দুধ নিল। সেই দুধ পান করে দেখে তার স্বাদ আলাদা। অন্য দুধের চেয়ে ভাল স্বাদ।

"এই স্বাদের পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। সেই কারণটা যে কি সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।" ছবিকে রবি বলল।

"কি করে?" ছবি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

রবি কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "পেয়েছি, ছবি। একটা উপায় পেয়েছি। জাদুর মাধ্যমে এর সমাধান করা যাবে।" বিয়ে উপলক্ষে গ্রামবাসীদের মনোরঞ্জনের জন্য তারা জাদু প্রদর্শনের ব্যবস্থা করল। ঐ প্রদর্শন দেখার জন্য বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে তন্তুশর্মাকে রবি বলল, "কাকা-বাবু, আপনি সমস্ত বিদ্যায় বিশারদ। আমরা ছেলেমানুষ। আপনি এলে আমরা খুব উৎসাহ পাব।" এ ধরনের ভাল ভাল কথা তন্তুশর্মাকে বলল। তন্তুশর্মা ওদের কথায় গর্ববোধ করে প্রদর্শন দেখার জন্য একেবারে সামনে সারিতে এসে বসল।

জাদু প্রদর্শনীর প্রথমেই রবি নানা ধরনের প্রদর্শন দেখাল। লোকে এক একটা প্রদর্শনী দেখে আর অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। দর্শকরা বুঝতে পারল রবি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তারপর রবি নীলুর কাছ থেকে এবং রাধারমণের কাছ থেকে দু গ্লাস দুধ নিল। সেই গ্লাস দুটো একটা উঁচু জায়-গাতে রাখল। সমস্ত দর্শক ঐ দুটো গ্লাসের দিকে তাকিয়ে রইল। তখন রবি দুধের ব্যাপারে আসল ঘটনা জানানোর

জন্য ভূমিকা শুরু করল, "আমার জাদু দেখার জন্য এখানে মানুষের সঙ্গে অনেক ভূতও এসেছে। মানুষ যেমন কফি খেতে ভালবাসে ভূতও ভালবাসে। ওদের জন্য আমি এখন কফি তৈরি করছি। প্রিয় দর্শকবৃন্দ মানুষেরা যেমন ভেজাল-হীন খাদ্য খেতে চাই, ভূতেরাও তেমনি ভেজালহীন খাদ্য বা পানীয় খেতে চায়। ভেজাল কিছু ওদের খেতে দিলে ওরা ভীষণ হৈচৈ করে তোলপাড় করে। অনেক সময় ভেজাল খাদ্য আমরা ধরতে পারি না কিন্তু ওরা ঠিক ধরে ফেলে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আপনারা নিজেরাই দেখতে পাবেন, ভূতের আগ্রহ ও

প্রতিবাদ।"

এই ভূমিকার পর রবি দুটো খালি গ্লাসে কফির লিকার অল্প অল্প করে ঢালল। তারপর নীলুর দেওয়া দুধ ওর গ্লাসে ঢালল। তৎক্ষণাৎ সুন্দর এক গ্লাস কফি হয়ে গেল। তারপর রবি রাধারমণের দুধ লিকার দেওয়া অন্য গ্লাসে ঢালল। মুহূর্তে ঐ গ্লাসের বস্তু কালো হয়ে গেল।

"হে প্রিয় দর্শকবৃন্দ, রাধারমণের দেওয়া দুধ দিয়ে যে কফি তৈরি হলো, তা ভূতেরা খেতে চাইছে না। কারণ এই কফিতে যে দুধ দেওয়া হয়েছে সেটা ভাল দুধ নয়। আশ্চর্য এই ভেজাল দুধ দেওয়া কফি ভূতেরা খেতে চায় না কিন্তু এই গ্রামের মানুষ দিনের পর দিন এই ভেজাল দুধ খাচ্ছেন।" রবি খুব সহজ সরল ভাবে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বলল।

রবির কথা দর্শকদের মধ্যে মন্ত্রের মত কাজ করল। ওরা ধড়িবাজ দুধ-ওয়ালা রাধারমণকে ছুঁটে গিয়ে ধরল। ওর বাড়িতে তদন্ত করে দশ বার বস্তা ময়দা পেল। সেই দিনই ওরা রাধা-রমণকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিল আর তার গরু মোষ নীলুকে দিয়ে দিল।

তন্তুশর্মা যে রাধারমণের পক্ষে ওকা-লতি করেছিল, তার জন্য সে ক্ষমা চেয়ে অর্থদণ্ড দিল। তন্তুশর্মাকে ওরা গ্রামে থাকতে দিল।

শহরে ফিরে গিয়ে রবি ছবি বন্ধুদের এই ঘটনা বললে, ওরা প্রশ্ন করল, "দুধকে কালো রঙ করলে কি করে।"

"খুব সহজেই। টিনচার আয়োডিনে জল মিশিয়ে দিলে কফির লিকারের মত দেখায়। কালো হওয়ার পেছনে আছে ভেজাল দুধ। ময়দা মেশানো ছিল বলে দুধ কালো হয়ে গেছে। আর নীলুর দুধে ভেজাল ছিল বলে রঙটা ঠিক ছিল।" বলল রবি।

রবির বক্তব্য শুনে জাদুর কায়দা কানুন শিখে বন্ধুরা খুব খুশী হলো।

# রাজার ঘুম

কোন এক রাজার বিছানা ছেড়ে দেরিতে ওঠার বদ অভ্যাস ছিল। বিছানা ছেড়ে উঠে প্রাতকর্ম সেরে জলযোগ করে রাজসভায় আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে যেত। ততক্ষণে রাজ দরবারের প্রত্যেকের খাবার সময় হয়ে যেত। কারো কাছে ব্যাপারটা ভাল লাগত না।

কিন্তু কেউ রাজাকে বলতে সাহস করত না। এদিকে রাজারও যে ভাল লাগত তা নয়। শেষে রাজা মন্ত্রীর পরামর্শ চাইল।

"মহারাজ, ভোরে গান শুনিয়ে আপনার ঘুম ভাঙ্গানোর ব্যবস্থা করলে ভাল হবে।" মন্ত্রী বলল।

গাইয়েদের নিয়োগ করা হল। পরের দিন ভোরে ওরা গান ধরল। রাজার ঘুম ভেঙ্গে গেল। অমন সুন্দর ঘুম ভেঙ্গে যাওয়াতে রাজার ভীষণ রাগ হল। বিছানা ছেড়ে উঠে রাজা ঐ গাইয়েদের চাবুকের চার ঘা করে মারার নির্দেশ দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

পরে দিন রাজা প্রতিজ্ঞা করে ঘুমোল, এবার সকাল সকাল উঠবে। গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়বে ঠিক করল। পরদিন ভোরে গাইয়েরা জোরে গাইলে রাজার ঘুম ভেঙ্গে যাবে, আর ঘুম ভেঙ্গে গেলে তাদের চাবুক খেতে হবে, এই ভেবে তারা ধীরে ধীরে গেয়ে চলে গেল।

সেদিনও রাজা যথারীতি দেরিতে উঠে ওদের জোরে গান না গাওয়ার অপরাধে চাবুকের চার ঘা করে মারার নির্দেশ দিল।

—রুদ্রপ্রসাদ রায়

# বাছুরের কথা বলা

কোন এক গ্রামে এক কিষাণের কাছে একটি বাছুর ছিল। সেই কিষাণের নাম হরিগোপাল। বিয়ে সে করে নি। সেই বাছুরই ছিল তার সব। প্রাণাধিক সে তাকে ভালবাসত।

হরিগোপাল প্রায় ভাবত, "ভগবান এই বাছুরের এত গুণ দিল কিন্তু কথা বলার ক্ষমতা দিল না!"

একই কথা তার মাথায় অনেক দিন ধরে ঘুরপাক খেতে থাকায় সেটা এক রকম মানসিক রোগে পরিণত হল। সে যাতে তাকে জিজ্ঞেস করত, "আচ্ছা, এমন কোন উপায় কি নেই যাতে বাছুর কথা বলতে পারে?"

"বাছুর আবার কথা বলবে কি? মাথাটাতা খারাপ হয়ে গেছে না কি?" সবাই তাকে বলতে লাগল।

লোকের এসব কথায় বেশি কাজ হল না। সে শুনেছিল সাধু বা যোগীদের ক্ষমতা অসীম। তারা দিনকে রাত করতে পারে। "হিমালয়ে খুঁজলে নিশ্চয় এমন সাধুর সন্ধান পাওয়া যাবে যিনি বাছুরের মুখে কথা ফোটাবেন।" হরিগোপাল আপন মনে বলতে লাগল। সে বাছুরটাকে দেখাশোনার ভার অন্যের হাতে দিয়ে চলে গেল হিমালয়ে। সেখানে যে সব সাধু সন্ন্যাসীদের দেখতে পেল তাদের প্রত্যেককে একই প্রশ্ন করতে লাগল। কিন্তু ঘোরাই সার হল, কোন ফল হল না।

ফেরা পথে এক সাধু হরিগোপালের হাতে একটা শেকড় দিয়ে বাছুরটাকে সেই শেকড় খাওয়াতে বলল। বাছুর ওটা খেলে কথা বলতে পারবে।

শেকড় পেয়ে হরিগোপালের সে কি আনন্দ!

পঙ্কজলাল ব্যানার্জি

হরিগোপাল সেটা নিয়ে বাড়ি ফিরল। বাছুর তাকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই লেজ নাড়তে নাড়তে ডাকতে লাগল।

"এতদিন আমি ছিলাম না বলে বাছুর না জানি কত কষ্ট পেয়েছে।" বলে হরিগোপাল ঐ শেকড়টাকে তার মুখে গুঁজতে গুঁজতে বলল, "নাও এটা খেয়ে নাও। এর পর তুমি কথা বলতে পারবে। তুমি তোমার মনের সব কথা জানাতে পারবে।"

বাছুর শেকড় খেয়েই বলল, "এতদিন কোথায় গিয়েছিলেন ?"

হরিগোপাল আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে যে তার কথা বলানোর জন্য কি কি করেছে তা সব জানাল। তারপর সে বাছুরকে বলল, "আর রোদে ঘুরো না। যাও ছায়ায় ঘুমোও।"

"আপনার কি, আপনি তো আরামে বিছানার উপর ঘুমোন। আমার জন্য একটা বিছানা পেতে দিতে পারেন না?" বাছুর বলল।

"ওরে বাপরে বাপ, কত কথা শিখে-নিল। এসব গাঁয়ের লোক শুনলে নজর দেবে। চল, বিছানা পেতে দিচ্ছি।" বলল হরিগোপাল।

তারপর হরিগোপাল খেতে বসলে, "আরে ও হরিগোপাল মশাই!" বলে চিৎকার করতে লাগল।

"কি হল ?" বলে হরিগোপাল খেতে খেতে উঠে এল।

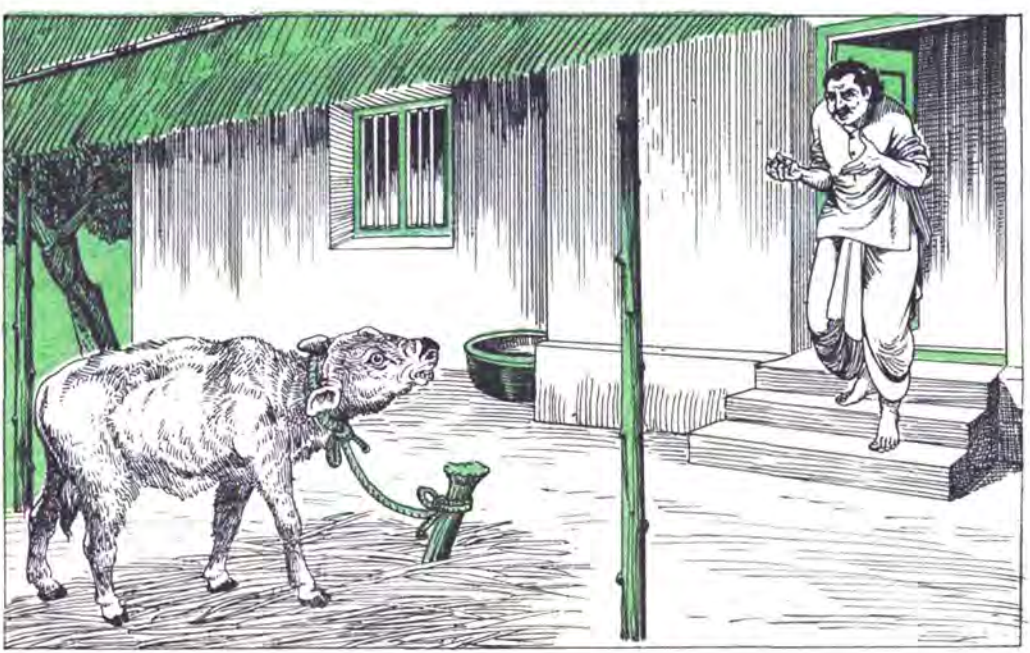

"আরে মশাই, আপনি তো আচ্ছা ভদ্রলোক। শুধু আপনি ভালমন্দ খাবেন? আমরা কি সব বানের জলে ভেসে এসেছি না কি মশাই?" মাথা নাড়তে নাড়তে বলল বাছুর।

হরিগোপাল বাছুরটাকেও খেতে দিল। কিন্তু বাছুর তাতে খুশী না হয়ে বলল, "কি দিলেন মশাই। শশা-টশা কি নেই? শুধু পেট ভরলেই চলবে, জিভের স্বাদ বলে একটা জিনিস আছে না?" আপনি জিভের স্বাদ মেটান না? আপনি মেটান আমি আর মেটাতে পারব না?

হরিগোপাল মুখ বুজে বাছুর যা যা খেতে চাইল খেতে দিল। এই ভাবে প্রত্যেক দিন নানা ব্যাপারে সেই বাছুর তাকে জ্বালাতে লাগল। গড়াতে গড়াতে এমন হল যে বাছুর তার জন্যও মশারি খাটাতে বলল বিছানা থেকে হরি-গোপালকে তুলে। হরিগোপাল আর সহ্য করতে না পেরে লাঠি তুলে বাছুরটাকে মারল। "ও ঘোষ মশাই, রায় মশাই, মণ্ডল মশাই আমি মরে গেলাম, আমাকে বাঁচান!" বলে বাছুর রাত দুপুরে চিৎকার করতে লাগল।

রাতদুপুরে কোন চোর অথবা ডাকাত হরিগোপালকে মারছে ভেবে ঘোষ, রায় আর মণ্ডলরা সেই অন্ধকারে ছুটে এসে হরিগোপালকেই চোর ভেবে বেদম মার দিল। তার মাথা ফেটে গেল।

পরে আর্তনাদ শুনে চিনতে পেরে সবাই তাকে ধরাধরি করে শুইয়ে পট্টি বাঁধল।

ওটা বাছুরের কণ্ঠস্বর শুনে ঘোষ, রায়, মণ্ডলরা তো অবাক।

কয়েকদিন পরে একটু ব্যথা কমতেই হরিগোপাল হিমালয়ের পথে ছুটে গেল।

মরিয়া হয়ে হরিগোপাল সেই সাধুর খোঁজ করতে লাগল যে তার এত বড় সর্বনাশ করেছে।

হরিগোপাল আরও একটা কারণে হিমালয়ের পথে ঘুরতে লাগল সে কারণ হল ঐ বাছুর নিয়ে বাড়িতে থাকার চেয়ে সেখানে থাকা অনেক ভাল।

# মহাভারত

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষিক্ত হওয়ার পর কৃষ্ণ অনেকদিন হস্তিনাপুরে ছিলেন।

কৃষ্ণ পিতা বসুদেবকে দেখার জন্য সাত্যকি ও সুভদ্রাকে নিয়ে দ্বারকায় গেলেন।

কৃষ্ণের মুখে আত্মীয় অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে, পাণ্ডব কৌরবদের যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা শুনে বসুদেব অভিমন্যুর জন্য গভীরভাবে বেদনা বোধ করলেন।

ইতিমধ্যে ধর্মরাজ অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় ধন সম্পদ হিমবৎ পর্বত থেকে আনার সংকল্প করলেন। পাণ্ডব সেনাদের একত্রিত করে ধৃতরাষ্ট্র ও কুন্তীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে উক্ত পর্বতের অভিমুখে রওনা হলেন।

তাঁরা নদী অরণ্য পর্বত অতিক্রম করে মরুত্ত যে স্থানে ধনসম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেই স্থানে পৌঁছালেন।

উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করে শিবের সাধনা করলেন। কুবের ও মণিভদ্রকে পূজা করে সেখান থেকে অসংখ্য সোনার ঘটি বাটি হাঁড়ি সংগ্রহ করলেন।

এই সমস্ত ধনসম্পদ পাণ্ডবদের অসংখ্য সৈন্য বহন করে আনতে পারেনি। তাঁদের সাহায্য নিতে হয়েছে বহু উট ঘোড়া ও অন্যান্য বাহক জীবকে। ঐ সব নিয়ে পাণ্ডবগণ সানন্দে হস্তিনাপুরে পৌঁছালেন।

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের আর দেরি নেই। কৃষ্ণ নিজের প্রতিশ্রুতির

কথা মনে করলেন। বলরামকে অগ্রবর্তী করে কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদ, ভগিনী সুভদ্রা, পুত্র প্রদ্যুম্ন চারুদেষ্ণ ও শম্ব এবং সাত্যকি কৃতবর্মা প্রভৃতি বীরগণের সঙ্গে হস্তিনাপুরে গেলেন।

আর ঠিক ঐ সময়ে পরীক্ষিৎ মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ট হল। কৃষ্ণ দুঃখিত হয়ে সাত্যকির সঙ্গে অন্তপুরে গেলেন। কুন্তী দ্রৌপদী সুভদ্রা ও অন্যান্য কুরুনারীগণ কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে ঘিরে ধরলেন।

কুন্তী বললেন, "বাসুদেব, তুমিই আমাদের একমাত্র উপায়। এই কুরুবংশ তোমারই আশ্রিত। অশ্বত্থামার অস্ত্র প্রভাবে অভিমন্যুর পুত্র মৃত হয়ে জন্মেছে। হে কৃষ্ণ, তুমি তাকে জীবিত কর এবং উত্তরা দ্রৌপদী সুভদ্রা ও আমাকে রক্ষা কর। অভিমন্যু উত্তরাকে বলেছিল, "তোমার পুত্র আমার মাতুল গৃহে ধনুর্বেদ ও নীতিশাস্ত্র শিখবে। মধুসূদন, আমাদের কামনা পূর্ণ কর।"

আকুল কণ্ঠে সুভদ্রাও বললেন, "পুণ্ডরীকাক্ষ, পাণ্ডবগণ ফিরে এসে এই খবরে অত্যন্ত ব্যথিত হবেন। তুমি থাকতে এই বালক জীবিত হবে না? তুমি ধর্মাত্মা সত্যবাদী, তোমার শক্তি আমার অজানা নেই। আমি তোমার বোন। পুত্রহীনা, তোমার শরণাপন্ন হয়েছি। তুমি প্রাণসঞ্চার কর।"

কৃষ্ণ সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে সূতিকা ঘরে ঢুকলেন। তিনি দেখলেন সে ঘর ফুলের মালা ফুল দিয়ে সাজানো। চার-দিকে ভরা কলস, ঘৃত, গোব কাঠের কয়লা সর্ষপ, পরিস্কৃত অস্ত্র, আগুন ও আরও নানা উপকরণে সজ্জিত রয়েছে। রয়েছে সেখানে রাক্ষসভয়বারক দ্রব্য। তাছাড়াও বৃদ্ধা নারী ও দক্ষ ভিষগ্‌গণ ও সেখানে আছেন। কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হলেন।

দ্রৌপদী তখন উত্তরাকে বললেন, "হে কল্যাণী, মধুসূদন এসেছেন।"

উত্তরা কিছুটা সংযত হয়ে শরীর আবৃত করে কাতর হয়ে বলতে লাগলেন,

"দেখুন, পুণ্ডরীকাক্ষ, আমি পুত্রহীনা, আমিও অভিমন্যুর মতই মৃত। ব্রহ্মাস্ত্রে বিনষ্ট আমার পুত্রকে জীবিত করুন আপনি। হে গোবিন্দ, আমি নত মস্তকে প্রার্থনা করছি, এর দেহে প্রাণসঞ্চার করুন। না হলে আমি এ জীবন ত্যাগ করব। আমার জীবনের আর কোন প্রয়োজন নেই। পুত্র কোলে নিয়ে আর আপনাকে প্রণাম করা হল না। এও তার পিতার মতই ত্যাগ করে যাচ্ছে।"

এই সব বলে কাঁদতে কাঁদতে উত্তরা জ্ঞান হারালেন। কুন্তী প্রভৃতি তাঁকে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। জ্ঞান ফিরে পেয়েও উত্তরা ছেলে কোলে করে নানা কথা বলে বিলাপ করতে লাগলেন।

এরপর কৃষ্ণ বললেন, "দেখ উত্তরা, আমার কথা মিথ্যে হবে না। সকলের সামনেই এ বালককে জীবিত করব।" কখনও যদি আমি মিথ্যে বলে না থাকি, যুদ্ধে বিমুখ না হয়ে থাকি, যদি ধর্ম ও ব্রাহ্মণগণ আমার প্রিয় হন, তবে অভিমন্যুর এই পুত্র জীবন লাভ করুক। যদি অর্জুনের সঙ্গে কখনও আমার বিরোধ না হয়ে থাকে, যদি সত্য ও ধর্ম সর্বদা আমাতে অবস্থান করে, যদি কংস ও কেশীকে আমি ধর্ম সংগত ভাবে বধ করে থাকি, তবে এই বালক জীবিত হোক। শিশুর শরীরে চেতনা আসতে লাগল।

অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র কৃষ্ণের দ্বারা বিরত

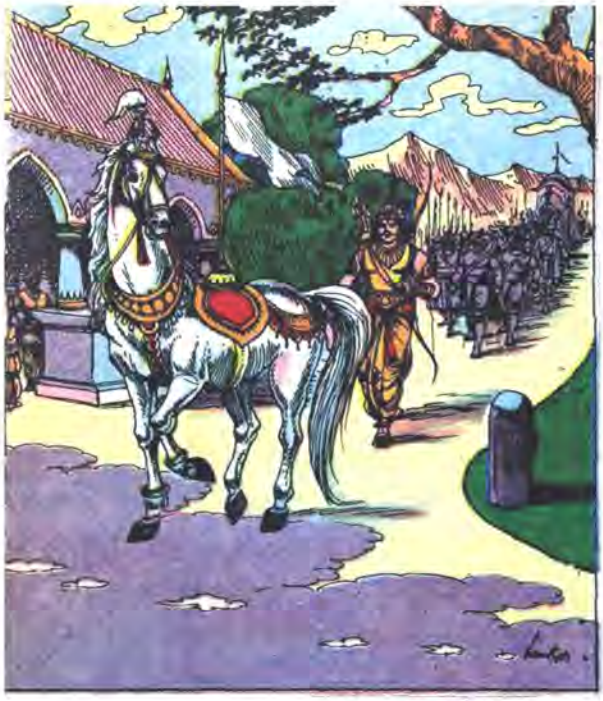

হল এবং ব্রহ্মার কাছে ফিরে গেল। তখন বালকের তেজদীপ্তিতে সে ঘর আলোকিত হল। আর রাক্ষসরাও পালিয়ে গেল। বালকের হাত পা নড়তে দেখে কুরুকুলের নারীগণ অতিশয় আনন্দিত হলেন। ব্রাহ্মণরা শান্তি বাক্য বললেন। দৈবজ্ঞ মল্ল সূত নট মাগধ প্রভৃতি কৃষ্ণের স্তবগান করতে লাগলেন।

উত্তরা পুত্রকে কোলে নিলেন এবং খুশী মনে কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ বহু রত্নাভরণ উপহার দিলেন। ভরত বংশ পরিক্ষীণ হলে অভিমন্যুর এই পুত্র জন্মেছে, তাই নাম রাখলেন পরীক্ষিৎ।

যখন পরীক্ষিতের একমাস বয়স হল তখন পাণ্ডবগণ ফিরে এলেন। হস্তিনাপুরে আনন্দ উৎসব চলতে লাগল।

ব্যাসদেব হস্তিনাপুরে এলে যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন "ভগবান, যজ্ঞের সব আয়োজন প্রস্তুত। আপনি অনুমতি দিন।"

ব্যাসদেব বললেন, "তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে পাপ মুক্ত হও।"

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, "দেবকীনন্দন, তোমার পরাক্রম ও বুদ্ধিতে আমরা পৃথিবী জয় করেছি। তুমিই আমাদের গুরু। অতএব তুমিই দীক্ষিত হয়ে আমার যজ্ঞ সম্পন্ন কর।"

কৃষ্ণ বললেন, "আপনি আমাদের রাজা ও গুরু। ন্যায়ধর্ম পালন করেন। আপনিই দীক্ষিত হয়ে যজ্ঞ করুন।"

ব্যাসদেবের উপদেশ মত চৈত্র পূর্ণিমায় যুধিষ্ঠির দীক্ষিত হলেন। যজ্ঞের অশ্ব ছাড়া হল। অনুগমণ করলেন অর্জুন।

অশ্ব নানা দেশ ঘুরে আসতে লাগল। সিন্ধুদেশে আসার পর সেখানকার রাজারা বিপুল বিক্রমে অর্জুনকে বাধা দিলেন। কিন্তু পরাজিত হলেন।

এইভাবে বিচরণ করতে করতে যজ্ঞাশ্ব মণিপুরে এল। পিতা ধনঞ্জয় এসেছে শুনে রাজা বভ্রুবাহন অতি বিনয়ের সঙ্গে উপস্থিত হলেন। অর্জুন বললেন, "তোমার আচরণ ক্ষত্রিয়ের মত নয়।"

অর্জুনের তিরস্কার শুনে উলূপী উপস্থিত হয়ে বললেন, "পুত্র, আমি তোমার বিমাতা উলূপী। তুমি তোমার মহাবীর পিতার সঙ্গে যুদ্ধ কর।"

পিতাপুত্রে তুমুল যুদ্ধের পর অর্জুন শরবিদ্ধ হয়ে পড়ে জ্ঞান হারালেন।

এ সময়ে রাজমাতা চিত্রাঙ্গদা রণস্থলে এসে পতি পুত্রকে দেখে শোকে কাতর হলেন এবং উলূপীকে অর্জুনের সংজ্ঞা-লাভের জন্য অনুরোধ করলেন। এ সময়ে বভ্রুবাহন চেতনা ফিরে পেলেন।

উলূপী সঞ্জীবন মণি এনে বভ্রুবাহনকে বললেন, "এই মণি পার্থের বুকে রাখ।"

বভ্রুবাহন তাঁর পিতার বক্ষে সেই সঞ্জীবন মণি রাখলেন। অর্জুন জেগে উঠলেন এবং পুত্রকে জড়িয়ে ধরলেন।

উলূপী বললেন, "মহাবাহু ধনঞ্জয়, মহাভারত যুদ্ধে অধর্মাচরণ করে ভীষ্মকে শিখণ্ডীর সাহায্যে নিপাতিত করেছিলে। সেই পাপ থেকে তুমি মুক্ত। পুত্র আত্ম-স্বরূপ, তাই পুত্র দ্বারা পরাজিত হয়েছ।"

তারপর দুই পত্নী ও পুত্রকে যজ্ঞস্থলে যাওয়ার কথা বলে বিদায় নিলেন অর্জুন। অশ্বের অনুসরণ করে তিনি বঙ্গ পুন্ড্র কোশল প্রভৃতি দেশে গেলেন এবং সেখানকার ম্লেচ্ছগণকে পরাজিত করলেন। দক্ষিণে আরও নানা দেশ

ঘুরে অশ্ব চেদিরাজ্যে এল। শিশুপালের পুত্র শরভ হার স্বীকার করলেন। কাশী অঙ্গ কোশল ইত্যাদি রাজ্যের রাজারা অর্জুনকে সংবর্দ্ধনা জানালেন।

আবার অর্জুন দক্ষিণ সমুদ্রের তীর দিয়ে গিয়ে দ্রাবিড় অন্ধ্র মাহিষক ও কোল্বগিরিবাসী বীরগণকে হারিয়ে দিয়ে দ্বারকায় এলেন। যাদব পুত্রগণ অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের অধিপতি উগ্রসেন আর বসুদেব তাদের রোধ করে অর্জুনকে অভ্যর্থনা করলেন।

এরপর পশ্চিম সমুদ্রের উপকূল এবং পঞ্চনদ প্রদেশ পেরিয়ে যজ্ঞের ঘোড়া এল গান্ধার রাজ্যে। শকুনিপুত্র গান্ধাররাজ

বহু সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করলেন অর্জুনকে। অনেক অনুরোধ করেও অর্জুন তাঁকে বিরত করতে পারলেন না। অর্জুন শরাঘাতে গান্ধারপতির শিরস্ত্রাণ উড়িয়ে দিলেন। শকুনিপুত্রকে যজ্ঞে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরলেন।

যুধিষ্ঠিরের নির্দেশমত স্থান ঠিক করা হল। অনেক প্রাসাদ তোরণ ও স্তম্ভ তৈরি করে যজ্ঞের স্থান নির্ধারণ করা হল। নানা দেশের রাজারা বহু রত্ন অশ্ব স্ত্রী ও আয়ুব নিয়ে এলেন। প্রত্যেক শিবিরে আনন্দের কলরব শোনা যাচ্ছিল। তাঁরা ইচ্ছেমত যজ্ঞস্থল ও চারিদিকের সাজসজ্জা দেখে বেড়াতে লাগলেন।

জায়গায় জায়গায় স্বর্ণভূষিত যূপকাষ্ঠ, স্থলচর জলচর পর্বত ও অরণ্য গাছপালা ও নানা রকম পশু পাখি স্তূপাকৃতি অন্ন দধি ঘৃত দেখে তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন। লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের পর প্রতিদিন দুন্দুভির শব্দে চারদিক মুখর।

অর্জুন যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে ফিরে এসে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির সবাইকে অভিবাদন করলেন। তারপর কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। তখন বভ্রুবাহন তাঁর মাতাকে নিয়ে সেখানে হাজির হলেন। গুরুজনকে বন্দনার পর তাঁরা কুন্তীর ভবনে গেলেন। কুন্তী সুভদ্রা ও দ্রৌপদীর সাথে তাঁরা মিলিত হলেন। দিব্যাস্ত্রযুক্ত মহামূল্য স্বর্ণাভরণে সজ্জিত রথ বভ্রুবাহনকে উপহার দিলেন কৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির প্রমুখরাও তাঁকে বহু অর্থ দিলেন।

যুধিষ্ঠিরকে ব্যাসদেব বললেন, "যজ্ঞের সময় হয়েছে। এবার তুমি যজ্ঞ আরম্ভ কর। যজ্ঞে তিনগুণ দক্ষিণা দান করলে তিন অশ্বমেধের ফল পাবে এবং জ্ঞাতি বধের পাপ থেকে মুক্তি পাবে।"

তারপর বেদজ্ঞ যাজকগণ যথানিয়মে সব কাজ করতে লাগলেন। ঋত্বিকগণ নানা দেবতার উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করলেন অনেক পশুপাখি বৃষ। তিন শত পশুর

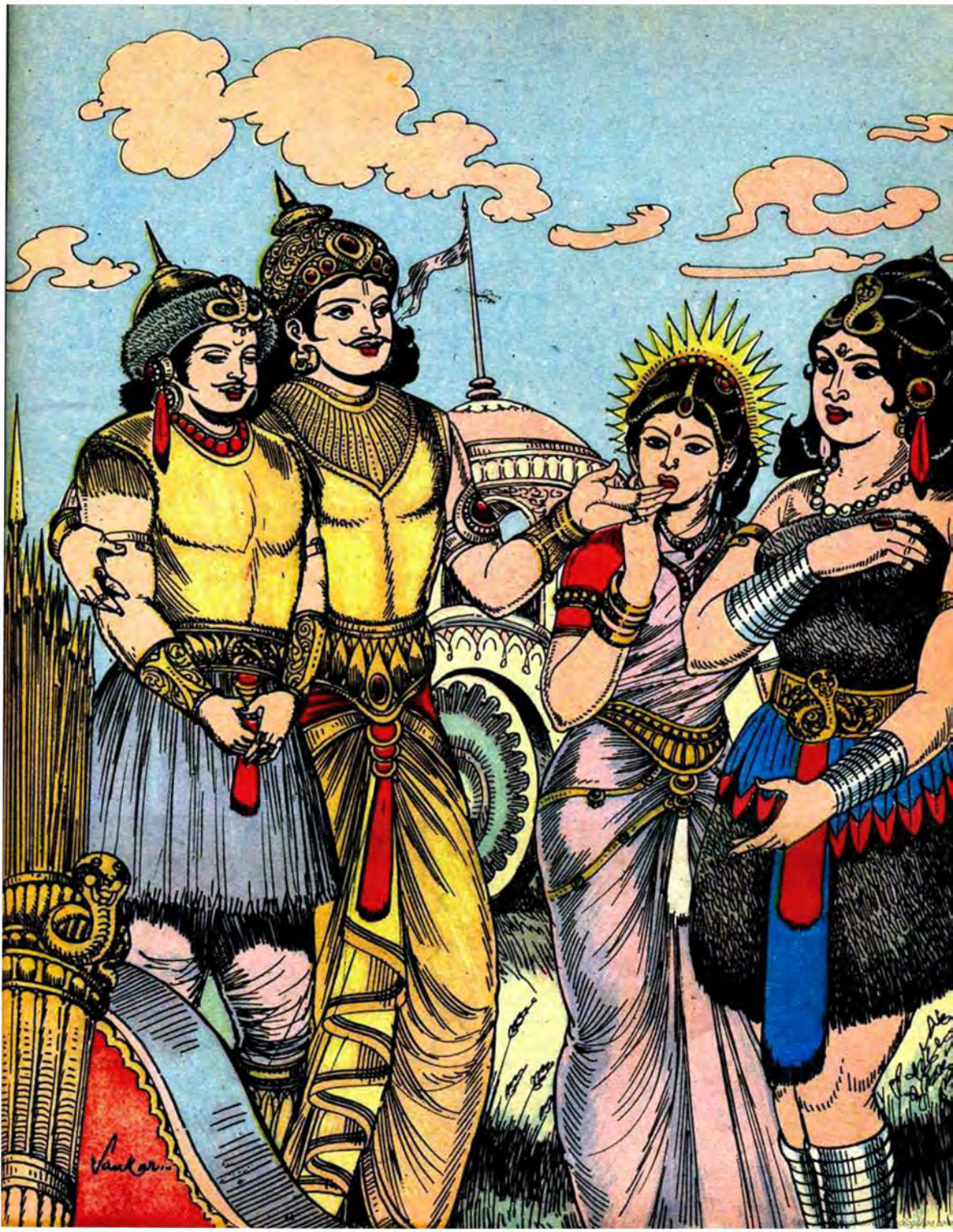
Shankar

সঙ্গে যজ্ঞের অশ্বও যূপবদ্ধ হল।

যথাবিধি অন্যান্য পশু অগ্নিতে উৎসর্গ করা হল। শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে যজ্ঞের অশ্ব বধ করলেন ব্রাহ্মণরা। দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠিরের পাশে বসালেন।

ষোলজন ঋত্বিক একে একে অশ্বের প্রতিটি অঙ্গ অগ্নিতে আহুতি দিলেন। যজ্ঞ শেষে সকল শিষ্যদের নিয়ে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের সংবর্ধনা করলেন। যুধিষ্ঠির তাঁদের সহস্র কোটি নিষ্ক এবং ব্যাসদেবকে বসুন্ধরা দক্ষিণা দিলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, "এই যজ্ঞে পৃথিবী দান করলাম। আর নিতে পারি না।"

চারদিক থেকে প্রশংসাবাণী ও অন্তরীক্ষ থেকে সাধু সাধু শোনা গেল।

ব্যাসদেব বললেন, "মহারাজ, পৃথিবী ফিরিয়ে দিচ্ছি, বদলে সোনা দাও।"

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "মহারাজ, আপনি ভগবানের আদেশ মেনে নিন।"

তখন যুধিষ্ঠিরাদি তিনগুণ দক্ষিণার কোটি কোটি গুণ দান করলেন। যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়ার পর ব্রাহ্মণরা প্রচুর ধন রত্ন নিয়ে বিদায় নিলেন। ব্যাসদেব তাঁর ভাগ কুন্তীকে দিয়ে দিলেন।

অন্যান্য রাজাদেরও প্রচুর ধন রত্ন অশ্ব স্ত্রী ইত্যাদি উপহার দিলেন। দুঃশলার পৌত্রকে সিন্ধুরাজ্যের রাজা করে দিলেন। কৃষ্ণ বলরাম বৃষ্ণি বংশের বীরগণ যথাযোগ্য সৎকার নিয়ে দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

জনমেজয়কে বৈশম্পায়ন বললেন, "মহারাজ, যজ্ঞ শেষ হলে এবং মহাদানের পর পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। তখন বিরাট এক নকুল যজ্ঞ স্থানে এল। তার চোখ নীল, এক পাশে তার সোনার বর্ণ। সে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "হে রাজগণ, কুরুক্ষেত্রবাসী এক উঞ্ছজীবী ব্রাহ্মণ যে ছাতুদান করেছিলেন তার সঙ্গেও আপনাদের এই যজ্ঞের তুলনা হয় না।"

নকুলের কথায় ব্রাহ্মণরা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ এবং কেন এই যজ্ঞের নিন্দা করছ?"

# মিত্র ভেদ

## এগার

রাজকুমারীর জবাবে বিষ্ণুরূপধারী তাঁতী বলল, "সুদর্শনা, তুমি আমায় চিনতে পারলে না, আমি তো তোমারি কাছে তোমারই জন্য এসেছি।"

"প্রভু, আপনি দেবতা। আমি মানুষের সন্তান। এক সাধারণ নারী। আপনার সঙ্গে আমার মিল কোথায়?" সুদর্শনা সবিনয়ে বলল।

"প্রিয়া, তুমি যে আমার অর্ধাঙ্গিনী লক্ষ্মী। সব ভুলে গেছ? অভিশাপের ফলে তুমি মানুষের রূপে কিছুকাল আছ। এর ফলে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আমি মানুষের রূপে তোমার সঙ্গে থাকার পর তুমি শাপমুক্ত হবে। যে তোমার ভাবী স্বামী সে তো একজন সাধারণ মানুষ। তার হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করার উদ্দেশে আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি। আমরা পরস্পরকে গন্ধর্ব বিবাহ করে নেব।" বলল তাঁতী।

রাজকুমারী নিজেকে ধন্য ভেবে খুব আনন্দিত হলো। এবং তাঁর স্ত্রী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করল।

প্রত্যেক রাত্রে বিষ্ণুরূপ ধারণ করে তাঁতী আসতো গরুড় বাহনে করে এবং ভোর বেলা ফিরে যেত। তার আসা যাওয়া কারও চোখে পড়ত না। যাওয়ার আগে প্রত্যেক দিন ভোরে রাজকুমারীকে সে বলত, "বৈকুণ্ঠে যাচ্ছি, আজ রাত্রে আবার আসব।

অনেক দিন কেটে যাওয়ার পর রাজকুমারীর পরিচারিকাদের মনে কেমন যেন এক সন্দেহ জাগল।

কিন্তু সেই সন্দেহ দূর করার জন্য

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

তারা অনেক চেষ্টা করেও সফল হতে পারল না। শেষে তারা রাজার কাছে গিয়ে রাজাকে গোপনে ভয়ে ভয়ে বলল, "মহারাজ, অভয় দিলে আপনাকে একটি কথা বলতে পারি।"

"নির্ভয়ে, বল।" রাজা বলল।

"মহারাজ, আমরা হাজার চোখে রাজকুমারীকে পাহারা দিলেও কে যেন প্রত্যেক রাত্রে রাজকুমারীর শয়ন কক্ষে আসছে আর সকলের চোখে ধূলো দিয়ে চলে যাচ্ছে। সে যে কোন্ পথ দিয়ে আসছে আর কোন্ পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে তা আমরা শত চেষ্টা করেও ধরতে পারছি না। রাজমহলের দরজা দিয়ে সে আসছে না, সিঁড়ি দিয়ে সে উঠছে না অথচ প্রত্যেক রাত্রে সে রাজকুমারীর ঘরে ঢুকছে আর ভোরের আগেই চলে যাচ্ছে। আমরা রাত দশটা পর্যন্ত রাজকুমারীর কাছেই থাকি। তাঁর ঘুম ধরে গেলে আমরা তাঁর কাছ থেকে চলে আসি। আবার সকাল পাঁচটায় তাঁর কাছে যাই। এই রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটার মধ্যে রাজকুমারী না ডাকলে তাঁর ঘরে যাওয়া আমাদের নিষেধ আছে। যে আসে সে এই দশটা থেকে পাঁচটার মধ্যেই আসে এবং চলে যায়। যা বলছি সত্য কথা বলছি। এখন মহারাজের যা ইচ্ছে তাই করবেন।" ভয়ে ভয়ে বলল পরিচারীকারা।

এই খবর পেয়ে রাজার খুব দুঃখ হল। উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করেও কুমারীর এতটা পতন হবে ভাবা যায় না। মেয়ের বাপ হওয়াই যেন পাপ। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে চিন্তিত মনে রাণীর কাছে গিয়ে তাকে আগাগোড়া যা শুনেছিল সব বলল। তারপর রাজা বলল, "যে আসছে তার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে।"

রাণী হাঁকপাঁক করে রাজকুমারীর ঘরে গিয়ে তাকে বলল, "হ্যাঁরে, তুই কি করছিস। বলি, বংশের গালে চূণকালি না মাখলেই কি নয়? কোন্ সেই স্বল্পায়ু

লোকটা তোর কাছে প্রত্যেক রাত্রে আসছে বলত ?"

রাজকুমারী লজ্জায় মাথা হেঁট করে মাকে জানাল যে তার ঘরে যিনি আসছেন তিনি তাদেরই কুল দেবতা স্বয়ং বিষ্ণু—নারায়ণ।

স্বয়ং নারায়ণ যে তার শয়নকক্ষে প্রত্যেক দিন আসেন সে কথা শুনে রাণী আনন্দে শ্রদ্ধায় বিহবল হয়ে গেল। রাণী মেয়েকে আর কোন প্রশ্ন না করে সোজা রাজার কাছে এসে বলল, "আপনি ধন্য। আপনি ধন্য। আমাদের কুলদেবতা স্বয়ং নারায়ণ প্রত্যেক দিন আপনার মেয়ের কাছে আসেন। আপনার মেয়ে নাকি স্বয়ং লক্ষ্মী। ওদের মধ্যে নাকি গন্ধর্ব বিবাহ হয়ে গেছে। আজ রাত্রে আমরা জানালা দিয়ে নারায়ণকে দর্শন করব। উনি কি আর আমাদের মত সাধারণ মানুষের ডাকে কোন দিন সাড়া দেবেন ?"

শুনে রাজার খুব আনন্দ হল। রাজা প্রতি মুহূর্ত অপেক্ষা করতে লাগল, কখন রাত হবে। কখন স্বয়ং নারায়ণের দর্শন পাবে।

রাজা ও রাণী জানালা দিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যথাসময়ে আকাশ পথে গরুড় বাহনে চড়ে বিষ্ণুরূপী

তাঁতী এল। তাকে দেখে রাজা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল, "ওগো, জগতে আমাদের চেয়ে ভাগ্যবান আর কেউ নেই। স্বয়ং লক্ষ্মীকে তুমি গর্ভে ধারণ করেছ। স্বয়ং নারায়ণ আমাদের জামাই হবে। এত দিনে আমাদের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। বিষ্ণুকে জামাই করে নিতে পারলে আমাকে আর আটকাতে পারবে কে ? আমি সারা বিশ্ব জয় করব।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরে বিক্রমসেন চক্রবর্তীর লোক সুপ্রতিবর্মার কাছে কর আদায় করতে এলো। এখন স্বয়ং নারায়ণের শ্বশুর হয়ে চক্রবর্তীর দূতদের সম্মান দেখাল না সুপ্রতিবর্মা। সেটা

লক্ষ্য করে ওরা বলল, "রাজা, কর দেবার সময় পেরিয়ে গেছে। এখনও তুমি কর দাওনি। বিক্রমসেন মহারাজা একবার ক্রুদ্ধ হলে আর উপায় থাকবে না। মানুষ তো দূরের কথা উনি কোন দেবতাকেও পরোয়া করেন্ না।"

রাজা সুপ্রতিবর্মা ওদের কথা কানেই তুলল না। অগত্যা বিক্রমসেনের দূত ফিরে গিয়ে তাদের রাজাকে সব জানাল। তখন রাজা বিক্রমসেন নিজের সৈন্য-বাহিনী নিয়ে রাজা সুপ্রতিবর্মার রাজ্য আক্রমণ করল। বহু প্রজা প্রাণ হারাল। অসংখ্য প্রজা সুপ্রতিবর্মার প্রাসাদে এসে আর্তনাদ করতে লাগল।

সুপ্রতিবর্মার মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজ-পুরোহিত ও রাজকর্মচারী সকলে তার কাছে এসে নানা প্রশ্ন করতে লাগল।

রাজা সুপ্রতিবর্মা ওদের কথা শুনে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলল, "অত দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কাল সকালের মধ্যে আমাদের উপর আক্রমণকারী প্রত্যেকে নির্মূল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।" তারপর রাজা মেয়েকে ডেকে বলল, "মা, তোমার স্বামীর ক্ষমতার উপর নির্ভর করে আমি এই যুদ্ধ যেচে নিয়েছি। তোমার স্বামীকে বলো কাল সকালের মধ্যেই যেন সমস্ত শত্রু সৈন্য নিশ্চিহ্ন করে ফেলে।

সেদিন রাত্রে বিষ্ণুরূপধারী তাঁতী এলে রাজকুমারী রাজার সব কথা জানাল। শুনে একগাল হেসে তাঁতী বলল, "প্রিয়ে, যার চক্রে হিরণ্যকশিপু, কংস প্রভৃতি শেষ হয়ে যায় তার কাছে তুচ্ছ মানব সেনা কিছুই নয়। ওদের আমি নির্মূল করে দেব। তুমি বলে বাবাকে জানিয়ে দাও।"

মেয়ে বাবাকে জানাল। রাজা মন্ত্রীকে জানাল। মন্ত্রী সমস্ত দেশে ঘোষণা করে দিল যে শত্রুদের সকালের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করা হবে। শুনে প্রজারা খুশী হলো।

# কোলোন ক্যাথড্রেল

সেণ্ট পিটার্সের উৎসর্গীকৃত এই ক্যাথেড্রল জর্মন দেশের কোলোন শহরে আছে। গোথিক শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে সারা পৃথিবীতে এর খ্যাতি। এর তৈরির কাজ ১২৪৮ খৃঃতে শুরু হয়ে ১৮৮০ খৃঃতেও শেষ হয়নি। এর চূড়ার উচ্চতা ৫০০ ফুটেরও বেশি।

ফটো : কে. এস. বিজয়াকর

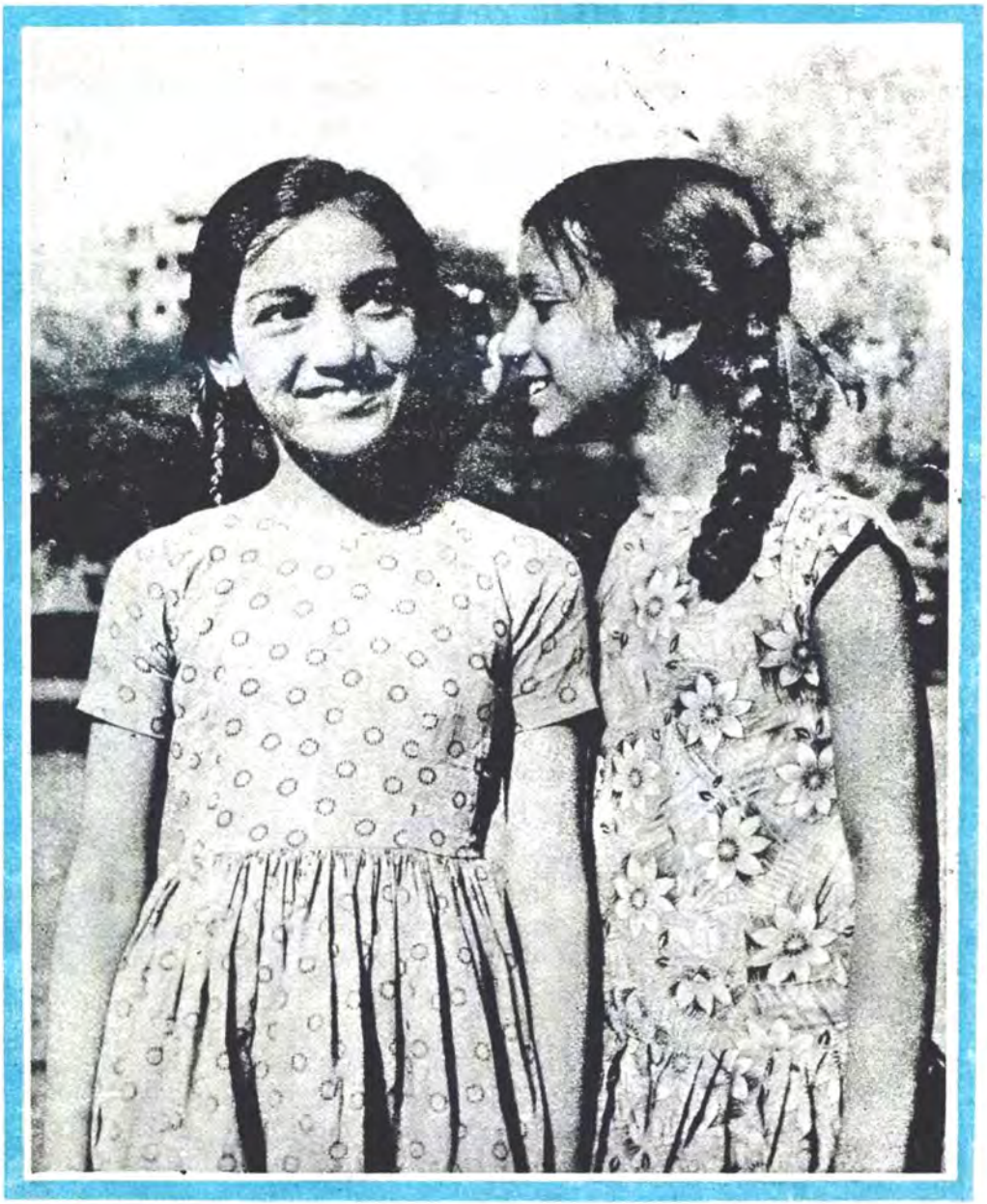

পুরস্কৃত নাম

গল্প যেমন করে বেড়াই

পুরস্কার পেলেন গীতা পাহাড়ী

ফটো : এন্. এম্. কচওয়ালা

৪৪৯ সার্কুলার রোড, ব্লক-৫
বোটানিক গার্ডেন, হাওড়া

কাজেও তেমন একসাথে যাই

পুরস্কৃত নাম

## ফটো-নামকরণ প্রতিযোগিতা ঃঃ পুরস্কার ২০ টাকা

★ ফটো নামকরণ ২০শে জুলাই '৭৪-এর মধ্যে পোস্ট কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে।

★ ফটোর নামকরণ দু-চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নাম-করণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। পুরস্কৃত নাম সহ বড় ফটো সেপ্টেম্বর '৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

# চাঁদমামা

### এই সংখ্যায় কয়েকটি গল্প-সম্ভার


| | | | |
|---|---|---|---|
| অমরবাণী | ৮ | ধারশোধ | ২৮ |
| যক্ষপর্বত | ৯ | মাহাত্ম্য | ৩৩ |
| পরিশ্রমের ফল | ১৭ | ধড়িবাজ দুধওয়ালা | ৩৯ |
| নীতির পরিবর্তন | ২১ | বাছুরের কথা বলা | ৪৬ |
| যে কথা অর্থহীন | ২২ | মহাভারত | ৪৯ |
| শিক্ষকের শাস্তি | ২৭ | মিত্র-ভেদ | ৫৭ |


*দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র*
প্রাচীন শিল্পকলা

*তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র*
আধুনিক শিল্পকলা


Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-600026. Controlling Editor : 'CHAKRAPANI'

*Photo by:* CHANDRAKANT KHATA

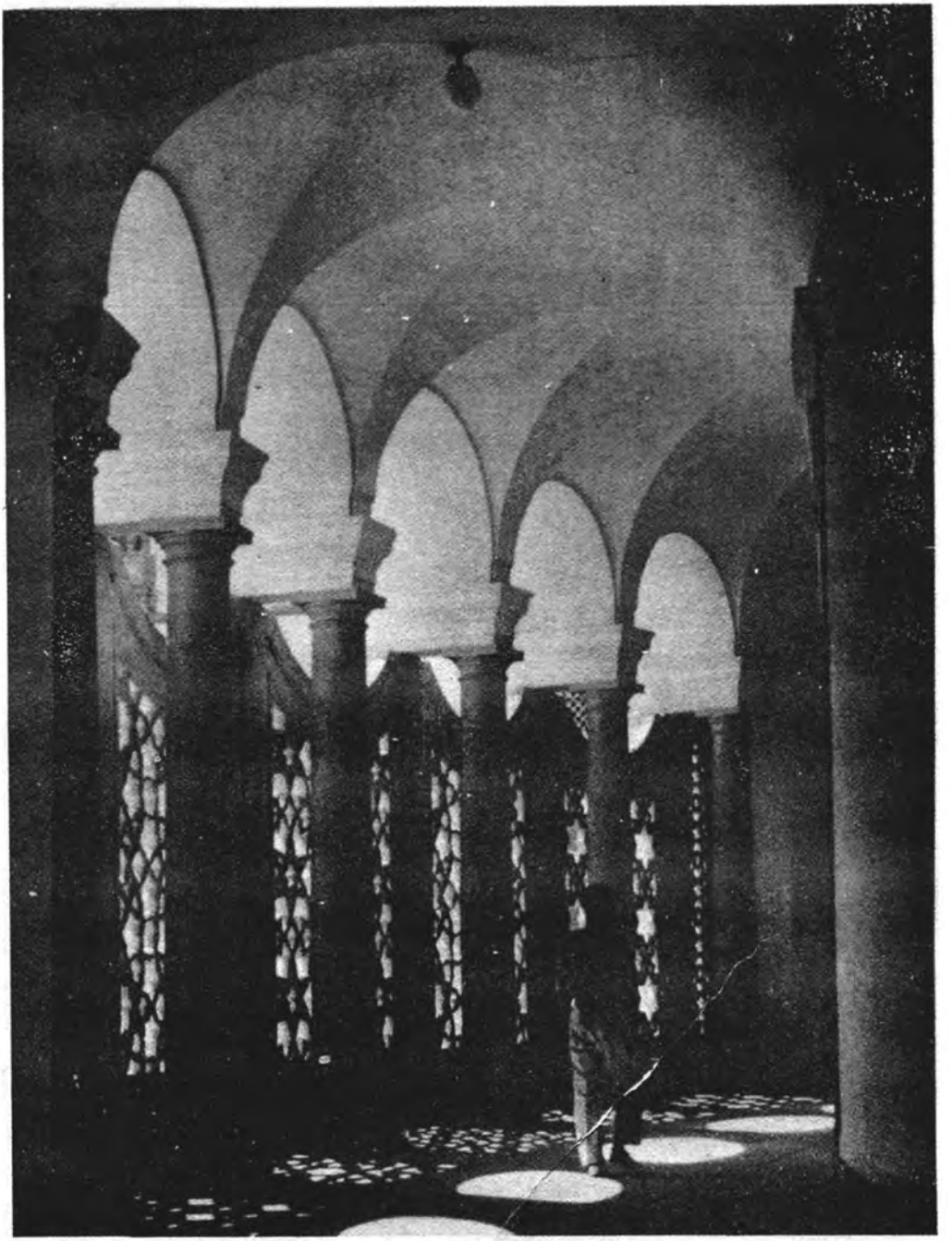

MODERN STRUCTURE

মিত্রভেদ